ভাইয়া জুতোগুলো পরে বলল, "বাহ্! একেবারে আয়নার মতো চকচকে বানিয়ে ফেলেছিস। ভেরি গুড।"

আমি কিছু বললাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আন্নু ভাইয়া আর আপু সেজেগুঁজে বের হয়ে গেলো দশটার সময়, আমি বের হলাম এগারোটার সময়।

আমি দুলি খালাকে কিছু বলিনি কিন্তু দুলি খালা বুঝে গেলো। বুঝে গিয়েও দুলি খালা আমাকে থামানোর চেষ্টা করল না। আমি যখন আমার ব্যাগের ভিতরে আমার ময়লা কাপড়গুলো আর বীজ গণিতের বইটা ঢুকালাম তখন দরজার চৌকাঠ ধরে দুলি খালা দাঁড়িয়ে রইল। আমি যখন বের হয়ে যাচ্ছিলাম তখন দুলি খালা তার শাড়ির খুট থকে কয়েকটা দুমড়ানো-মোচড়ানো নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল, বলল, "নেও। তোমার কাছে রাখো।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, দুলি খালা লাগবে না।"

"না লাগলেও রাখো।"

আমি কোন কথা না বলে টাকাগুলো পকেটে রাখলাম। দুলি খালা বলল, "সাবধানে থাকবা। তোমার কিন্তু খুব বড় বিপদ।"

আমি কোন কথা বললাম না। দুলি খালা বলল, "মানুষরে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে বাবা-মায়ের দোয়া। তোমার বাবা নাই। তোমার মা তোমার জন্যে দোয়া করে না। তোমার খুব বিপদ।"

আমি বললাম, "তুমি দোয়া করো।"

"আমি দোয়া করি। আমি সব সময় দোয়া করি। কিন্তু আমার দোয়া কুনো কাজে আসে না বাবা।"

আমি আর কোন কথা না বলে বাসা থেকে বের হয়ে এলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছন ফিরে বাসাটাকে দেখে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম।

ছুটির দিন বলে রাস্তাঘাটে ভিড় একটু কম। আমি বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা নিরিবিলি জায়গায় দেওয়ালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। বাসা থেকে কোন কিছু চিন্তা না করে বের হয়ে এসেছি, এখন কী করব, কোথায় যাব বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবতে হবে।

আমি যখন কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছেছি তখন বিকাল হয়ে গেছে। ট্রেন স্টেশন মনে হয় কখনোই ফাঁকা হয় না, সব সময়েই হয় কোন ট্রেন যাচ্ছে না

হয় কোন ট্রেন আসছে, মানুষজনের ভিড়। যারা যাচ্ছে এবং যারা আসছে তাদের চেহারায় এক ধরনের ব্যস্ততা থাকে। এদের ছাড়াও স্টেশনে অন্য এক ধরনের মানুষ থাকে, তারা কোথাও যায় না, তারা রেল স্টেশনেই থাকে, এটাই তাদের বাড়িঘর। তাদের চেহারায় কোন ব্যস্ততা নেই। আমার চেহারা নিশ্চয়ই এখন এদের মতো হয়ে গেছে, আমারও কোন ব্যস্ততা নেই। আমি হেঁটে হেঁটে ট্রেনগুলো দেখলাম। কোনটা কোথায় যাচ্ছে ট্রেনের গায়ে লেখা আছে কিন্তু সেটা নিয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই। এর মাঝে কোন একটাতে উঠে পড়ব। ইচ্ছে করলে ছাদেও বসতে পারি, সেটা মনে হয় বেশি মজার হবে।

খুঁজে খুঁজে একটা ভাঙ্গাচোরা ট্রেন ঠিক করে আমি তার ছাদে উঠে পড়লাম। এটা নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে যাবে, থামতে থামতে যাবে! সেটাই ভাল, আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই। ট্রেনের ছাদে আমার মতো আরো অনেকে আছে। পা দুলিয়ে উদাস মুখে বসে আছে। ট্রেনের ছাদে উঠে বসলে হঠাৎ ভিন্ন একটা অনুভূতি মনে হয়। যারা প্লাটফরমে হাঁটাহাঁটি করতে থাকে তাদেরকে অন্য একটা জগতের মানুষ বলে মনে হয়, মনে হয় আকাশের কাছাকাছি বসে আমি পৃথিবীর মানুষকে দেখছি।

ট্রেনের ইঞ্জিন যখন হুইসিল দিয়ে নড়তে শুরু করল তখন হঠাৎ মনে হলো মেয়ের গলায় কেউ যেন আমাকে ডাকছে! আমি অবাক হয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম এবং তখন আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম প্রিয়াংকা ট্রেনটার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে, "তপু- তপু- তপু-"

আমি কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারলাম না কী করব! এই স্টেশনে প্রিয়াংকা কোথা থেকে এলো, যদি এসেই থাকে তাহলে আমাকে ডাকছে কেন? আর সত্যিই যদি আমাকেই ডাকছে তাহলে কেমন করে জানল আমি এখানে?

ট্রেনটা তখন নড়তে শুরু করেছে, কী করব বুঝতে না পেরে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন প্রিয়াংকা আমাকে দেখে ফেলেছে, সে চিলের মতো চিৎকার করতে লাগলো, "তপু, এই তপু— নাম- নাম তাড়াতাড়ি—"

চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে কীভাবে নামতে হয় আমার জানা নেই। দেখতে দেখতে ট্রেনটার গতি বেড়ে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে আমি যদি না নামি তাহলে আর নামতেও পারব না! আমি তাই আগেপিছে কিছু চিন্তা না করে একটা লাফ দিলাম, ট্রেনের ছাদ অনেকটা উঁচু, সেখান থেকে শক্ত প্লাটফর্মে লাফিয়ে পড়া সোজা ব্যাপার না। প্রথমে মনে হলো আমি বুঝি থ্যাঁতলে গেছি, হাড়গোড় সব ভেঙ্গে গেছে, আর কোন দিন বুঝি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব না। প্রিয়াংকা ছুটে

এসে আমাকে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে, চিৎকার করে বলছে, "সর্বনাশ অপু! সর্বনাশ! ব্যথা পেয়েছিস? ব্যথা পেয়েছিস তুই?"

আমি মাথা নাড়লাম। কোঁকাতে কোঁকাতে বললাম, "ঠ্যাং-এর হাড্ডি মনে হয় ভেঙ্গে গেছে।"

প্রিয়াংকা চেঁচাতে লাগলো, "সর্বনাশ! হায় আল্লা! এখন কী হবে?"

আমি প্রিয়াংকাকে ধরে দুই পা হেঁটে বললাম, "নাহ! মনে হয় ভাঙ্গে নাই শুধু মচকেছে।"

প্রিয়াংকার মনে হয় জানে পানি ফিরে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হলো? কাঁদছিস কেন?"

আমি এর আগে কখনো কাউকে তুই করে বলি নি, এই প্রথম সেটা করলাম এবং সেটা করেছি নিজের অজান্তেই।

প্রিয়াংকা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি জানি! আমি সব জানি তপু।"

আমি ভুরু কুচকে প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "তুই সব কী জানিস?"

"তোর কথা।" প্রিয়াংকা আমার হাত ধরে রেখে কান্না সামলাতে সামলাতে বলল, "আজকে আমি তোদের বাসায় গিয়েছিলাম।"

হঠাৎ করে মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি থেমে গেছে। প্রিয়াংকা সব কিছু জেনে গেছে? আমার নিঃশ্বাস মনে হয় বন্ধ হয়ে গেলো, কোনমতে বললাম, "আমার বাসায় গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ।"

আমি কঠিন গলায় বললাম, "কেন?"

"প্লিজ তপু তুই রাগ করিস না। প্লিজ।"

"কেন গিয়েছিলি আমার বাসায়?"

"তুই অঙ্ক করতে এতো ভালবাসিস। তাই তোর জন্যে একটা গণিতের বই নিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তোকে খুশি করে দেব।"

আমি প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই আমার বাসা কেমন করে চিনেছিস?"

"লুকিয়ে তোর পিছু পিছু গিয়ে একদিন তোর বাসা চিনে এসেছি।"

আমি বিস্ফারিত চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম, এই মেয়েটার কী মাথা খারাপ? প্রিয়াংকা আবার কাঁদতে লাগলো।

আমি বললাম, "কাঁদছিস কেন?"

প্রিয়াংকা আমার হাত ধরে বলল, "তোর এতো কষ্ট তপু। কেউ জানে না! আমি যদি আজকে তোর বাসায় না যেতাম, যদি দুলি খালার সাথে দেখা না হতো তাহলে আমিও জানতাম না।"

আমি কোন কথা না বলে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা বলল, "দুলি খালা বলল তুই আর সহ্য করতে না পেরে বাসা থেকে চলে গেছিস! এটা হতে পারে না।"

"কী হতে পারে না?"

"আমরা সবাই আছি, আর কেউ তোকে সাহায্য করতে পারবে না? তুই একা একা সহ্য করতে না পেরে বাসা ছেড়ে চলে যাবি? জীবনটা শেষ করে দিবি?"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আমার আসলে কোন জীবন নাই। আমি আসলে ভাল ছেলে না। আমি চোর। আমি পড়াশোনা করি না- আমি-"

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, "তুই যে এখনো বেঁচে আছিস, তুই যে পাগল হয়ে যাস নাই সেটাই সাংঘাতিক ব্যাপার? প্লিজ তপু তুই এটা করিস না?"

"কী করব না?"

"তুই চলে যাস না।"

"আমি চলে যাব না?"

"না।"

আমি কিছুক্ষণ প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কয়েকবার চেষ্টা করে বললাম, "কেন?"

"তুই বড় হয়ে বিখ্যাত একজন ম্যাথমেটিশিয়ান হবি- এখন যদি তুই তোর জীবনটা শেষ করে ফেলিস, কেমন করে হবে?"

আমি অবাক হয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, "আমি বড় হয়ে বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান হব?

"হবি না? নিশ্চয়ই হবি। সবাই বলেছে তুই অসম্ভব ভাল ছাত্র ছিলি হঠাৎ করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিস। আসলে তুই পড়াশোনা ছেড়ে দিস নি- তুই আর পড়াশোনা করতে পারছিস না।"

আমি কিছু বললাম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা আবার বলল, "সবাই আমাকে বলেছে তুই রাস্তাঘাটে মারামারি করে আসিস বলে তোর হাতে পায়ে শরীরে কেটেফুটে থাকে। আসলে, আসলে-"

প্রিয়াংকা কথাটা শেষ না করে আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো। আমি চোখ বড় বড় করে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার জন্যে কাঁদতে পারে পৃথিবীতে এরকম মানুষ আছে? প্রিয়াংকা কোনমতে চোখ মুছে বলল, "তোর আব্বু মারা গেছে। তোর আম্মু এখন তোকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়, তোর ভাই-বোন থেকেও নেই, ক্লাসে তোর বন্ধুবান্ধব নেই, তুই একা- কত কষ্টের একটা জীবন! তুই আমাকে একটা সুযোগ দে, আমি তোর আম্মু হব, তোর ভাই হব, বোন হব, তোর বন্ধুবান্ধব হব- দেখিস তুই, খোদার কসম!"

প্রিয়াংকার কথা শুনে আমি হঠাৎ হেসে ফেললাম। আমাকে হাসতে দেখে প্রিয়াংকা একটু উৎসাহ পেলো, বলল, "তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না? আমি ছোট হতে পারি কিন্তু আমি অনেক কিছু করতে পারি। তুই আমাকে সুযোগ দে। প্লিজ।"

"কীসের সুযোগ দেব?"

"বড় হয়ে একজন বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান হবার।"

"ধুর! তোর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

প্রিয়াংকা মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহুঁ তপু। তুই আমার কথা অবিশ্বাস করিস না। তা না হলে তুই বল, আমি কেমন করে ঢাকা শহরের এক কোটি লোকের মাঝে তোকে খুঁজে বের করলাম? খোদা যদি আমাকে সাহায্য না করতো তাহলে আমি কী তোকে খুঁজে বের করতে পারতাম?"

আমাকে স্বীকার করতেই হলো ঢাকা শহরের এক কোটি লোকের মাঝে একজনকে খুঁজে বের করে ফেলা খুব সহজ কথা নয়। খোদা নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে। প্রিয়াংকা চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে কী বুঝেছিস? তার মানে এটা খোদার ইচ্ছা!"

"কোনটা খোদার ইচ্ছা?"

"যে তুই একজন বিখ্যাত ম্যাথমেটিশিয়ান হবি।"

আমি আবার হাসলাম। এবারে শব্দ করে আর জোরে। অনেক দিন পর আমি সত্যি সত্যি হাসলাম- হাসলে যে এতো ভাল লাগে সেটা আমি কোন দিন জানতাম না। প্রিয়াংকা তার ব্যাগের ভেতর থেকে লাল কাগজ দিয়ে মোড়ানো একটা বই আমার দিকে এগিয়ে দিল, বলল, "এই নে। এই বইটা দেবার জন্যে তোর বাসায় গিয়েছিলাম।"

আমি প্যাকেটটা খুলে দেখি একটা ইংরেজি গণিতের বই। বইটা খুলতেই ভেতরে নানা ধরনের সমীকরণ বের হয়ে এলো আর সেটা দেখে হঠাৎ আমার

জিবে প্রায় পানি এসে গেলো! আমি নিজেও জানতাম গণিত আমার এতো প্রিয় একটা বিষয়। আমি বইটা ব্যাগে ঢুকিয়ে বললাম, "চল যাই।"

"আগে কথা দে, তুই বাসা থেকে পালিয়ে যাবি না।"

"কথা দিলাম।"

"আমাকে ছুঁয়ে কথা দেয়।"

"ছুঁয়ে কথা দিলে কী হয়?"

প্রিয়াংকা গম্ভীর গলায় বলল, "কথা ভেঙ্গে ফেললে যাকে ছুঁয়ে কথা দিয়েছিস সে মরে যায়।"

আমি বললাম, "আমি এসব বিশ্বাস করি না।"

"আমিও করি না। তবু ছুঁয়ে কথা দে। প্লিজ।"

আমি প্রিয়াংকাকে ছুঁয়ে বললাম, "ঠিক আছে কথা দিলাম।"

"গুড।" প্রিয়াংকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার চোখ এখনো ভেজা- একজন মানুষের চোখে পানি কিন্তু মুখে হাসি- এটা ভারি বিচিত্র একটা ব্যাপার।

আমরা দুজন তখন হাঁটতে শুরু করলাম। বিকেল পড়ে এসেছে, বাসায় যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রিয়াংকা বলল, "আগে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে হবে।"

"ঠিক আছে পৌঁছে দেব।"

প্রিয়াংকাকে বাসায় পৌঁছে আমি যখন বাসায় রওনা দিয়েছি তখন হঠাৎ আমার মনে হলো আমি আর আগের তপু নই। আমি এখন অন্য রকম একজন তপু। প্রিয়াংকা আমার ভেতরে খুব বড় একটা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

নতুন আমি

দুলি খালা আমাকে দেখে অসম্ভব খুশি হয়ে উঠল, বলল, "পাগলী মেয়েটা তোমারে খুঁইজা পাইছে?"

আমি মাথা নাড়লাম। দুলি খালা বলল, "এই রকম মাইয়া আমি জীবনে দেখি নাই। কইলজাটা এক দিকে মাখনের মতো নরম অন্যদিকে পাথরের মতোন শক্ত।"

আমি বললাম, "সেইটা কেমন করে হয়?"

দুলি খালা জ্ঞানী মানুষের মতো বলল, "হয়। প্রথম যখন আসছে আমি তারে কিছু বলি নাই। সে বলছে তোমার পড়ার টেবিলে একটা বই রেখে যাবে। আমি বলছি তোমার নিজের পড়ার টেবিল নাই। তখন বলছে তোমার বিছানার উপর রাখবে। আমি বলছি নিজের বিছানা নাই। তখন বলছে তুমি যেখানে ঘুমাও সেইখানে রাখবে। আমি আর কী করি? এই স্টোররুমে নিয়া আসছি।"

আমি বললাম, "ও!"

দুলি খালা বলল, "এক নজর দেইখাই বুইঝা গেছে। তখন ভেউ ভেউ করে কান্দা শুরু করছে। এই জন্যে বলি কইলজাটা মাখনের মতো নরম।"

আমি বললাম, "ও।"

দুলি খালা বলল, "যখন শুনলো তুমি চইলা গেছ তখন পাগলের মতো হয়া গেল। বলল, আমি খুঁইজা বার করব। আমি বললাম ঢাকা শহরে লাখ লাখ মানুষ! তুমি খুঁজবা কেমনে? সে বলল জানি না। কিন্তু আমি চেষ্টা করমু। খোদা যদি সাহায্য করে তাহলে বার করমু।" দুলি খালা হেসে বলল, "খোদা তারে সাহায্য করছে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।" তারপর পকেট থেকে দুমড়ানো মোচড়ানো নোটগুলো বের করে দুলি খালার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "নাও দুলি খালা, তোমার টাকা।"

দুলি খালা বলল, "রাখো তোমার কাছে।"

আমি বললাম, "না দুলি খালা। আমার কাছে রাখলে অনেক বিপদ হতে পারে। আম্মু যদি খুঁজে পায় তাহলে আমাকে খুন করে ফেলবে।"

দুলি খালা মাথা নাড়ল, বলল, "সেইটা সত্যি কথা।" আমার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে তার শাড়ির খুটে বেঁধে রেখে বলল, "ঠিক আছে। আমি আমার কাছে রাখলাম, তোমার যখন লাগবে তখন আমার কাছ থেকে নিয়ো।"

আমি মাথা নেড়ে স্টোররুমে ঢুকে গেলাম। প্রিয়াংকা আমাকে যে বইটা দিয়েছে সেটা পড়ার জন্যে আমি আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

মানুষ যেভাবে ডিটেকটিভ বই পড়ে আমি সেভাবে গণিতের বইটা পড়ে শেষ করলাম। আমি আর দুলি খালা রান্নাঘরে বসে বসে খাই, আজকে খাবার সময়েও বইটা পড়েছি। শুধু দশটার সময় আমার বই পড়া বন্ধ করতে হলো, তখন মিচকি বেড়াতে এলো। আজকাল তার সাহস বেড়েছে, আমার শরীরের উপর দিয়ে ছুটোছুটি করে। ভাল খেয়ে-দেয়ে তার স্বাস্থ্যটাও একটু ভাল হয়েছে মনে হলো। পেটটা নাদুসনুদুস। আমি তার সাথে একটু গল্প গুজব করলাম, ভাব দেখে মনে হয় সে আমার সব কথা বুঝে!

রাত্রে ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হলো, শোওয়ার পরও চট করে চোখে ঘুম এলো না, মাথার মাঝে জিটা ফাংশন আর অয়লার ইকুয়েশন ঘোরাঘুরি করতে লাগলো! শেষ পর্যন্ত যখন ঘুমিয়েছি তখন নিশ্চয়ই অনেক রাত।

সকালে ঘুম ভাঙল ভাইয়ার ডাকাডাকিতে। আমি চোখ কচলে ভাইয়ার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে ভাইয়া?"

"তুই কাপড় ইস্ত্রি করতে পারিস?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "আগে কখনও করি নি।"

"আগে না করলে কী হয়েছে? এখন করবি। আমার এই প্যান্টটা একটু ইস্ত্রি করে দে দেখি। সাবধান পুড়িয়ে ফেলিস না যেন।"

আমি তাই ভাইয়ার প্যান্টটা ইস্ত্রি করে দিলাম, খুব সাবধানে করেছি যেন না পোড়ে। ভাইয়া দেখে খুব খুশি হয়ে গেল, বলল, "বাহ্! তুই দেখি ভাল ইস্ত্রি করতে পারিস!"

আমি কিছু বললাম না। ভাইয়া তার চেয়ারের উপর রাখা কয়েকটা শার্ট প্যান্ট দেখিয়ে বলল, "এগুলোও ইস্ত্রি করে রাখিস। ঠিক আছে?"

আমি কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

স্কুলে গিয়ে আমার প্রিয়াংকার সাথে দেখা হলো, প্রিয়াংকা এমন ভাব করল যেন কিছুই হয় নি। এমন কী বসলও অন্য জায়গায়, আমার কাছে নয়। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি অন্য যে কোন ছেলে-মেয়ে যদি আমার ব্যাপারটা জানতো তাহলে এতক্ষণে পুরো স্কুলে সেটা জানাজানি হয়ে যেতো। অনেক দিন পর আজকে আমি ক্লাসে কী পড়াচ্ছে সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনারও চেষ্টা করলাম। দীর্ঘদিন পড়াশোনা না করে করে আমার অভ্যাসও চলে গেছে, স্যারদের কথাবার্তায় মনোযোগও ধরে রাখতে পারি না। ফোর্থ পিরিয়ডে ক্লাসে একটা নোটিশ এলো, স্যার নোটিশটা পড়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "জয়ন্ত, মামুন আর মৌটুসি তোরা তিনজন ক্লাস ছুটির পর শিরীন ম্যাডামের সাথে দেখা করবি।"

জয়ন্ত মামুন আর মৌটুসি হচ্ছে ক্লাসের প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছাত্রছাত্রী। কাজেই তাদের কোন ঝামেলার মাঝে পড়ে শাস্তির জন্যে যেতে হচ্ছে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মৌটুসি হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "কেন স্যার?"

স্যার ভুরু কুঁচকে নোটিশটা আরেকবার পড়ে বললেন, "কী জানি! গণিত অলিম্পিয়াড না কী যেন হচ্ছে।"

"সেটা কী স্যার?"

স্যার আবার নোটিশটা পড়লেন, পড়ে বললেন, "মনে হয় গণিতের একটা কম্পিটিশান হবে সেখানে তোরা যাবি।"

মৌটুসি চোখ বড় বড় করে বলল, "গণিতের কম্পিটিশান?" তারপর হি হি করে হেসে ফেলল। চিন্তা করলে ব্যাপারটা আসলেই হাস্যকর- কয়েকজন কাগজে কলমে হাঁসফাঁস করে অঙ্ক করছে, কার আগে কে করতে পারে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা!

প্রিয়াংকা হাত তুলে বলল, "স্যার, এই গণিতের কম্পিটিশনে সবচেয়ে ভাল যে গণিত পারে তাদেরকে পাঠানো উচিত না?"

স্যার বললেন, "তাই তো উচিত।"

"তাহলে স্যার আলাদা করে ক্লাসে একটা গণিতের কম্পিটিশন করা উচিত না? কে ভাল গণিত পারে সেটা বের করা উচিত না?"

স্যার চোখ পিটপিট করে প্রিয়াংকার দিকে তাকালেন, "কেন? তোর কী খুব যাবার শখ নাকী?"

"না স্যার।" প্রিয়াংকা মাথা নাড়ল, বলল, "আমার শখ নেই স্যার। আমি গণিতে খুব দুর্বল! কিন্তু অন্য কেউ তো থাকতে পারে যারা গণিতে খুব ভাল!"

"তা নিশ্চয়ই পারে।" বলে স্যার হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন। প্রিয়াংকা মন খারাপ করে বসে পড়ল, সে নিশ্চয়ই আমার জন্যে চেষ্টা করছিল! আমার অবশ্যি গণিতের কম্পিটিশনে যাবার এক বিন্দু ইচ্ছে নেই! এইসব কম্পিটিশন আমার জন্যে নয়!

প্রিয়াংকা অবশ্যি চেষ্টা করা ছাড়ল না, শিরীন ম্যাডামের কাছে গিয়ে চেষ্টা করল, শিরীন ম্যাডাম নতুন করে ঝামেলা করতে রাজি হলেন না, স্কুলের ফার্স্ট সেকেন্ড আর থার্ড ছাত্রছাত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন। প্রিয়াংকা তখন সাহস করে একেবারে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কাছে হাজির হলো, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মন দিয়ে তার কথা শুনে বললেন, এবার হাতে একেবারে সময় নেই। পরেরবার চেষ্টা করা যাবে। তা ছাড়া গণিতের কম্পিটিশন একটা বিচিত্র বিষয়- আগে কখনো এরকম কিছু হয় নি। যারা আয়োজন করছে কয়দিনের ভিতরেই তাদের উৎসাহ ফুরিয়ে যাবে- কাজেই বিষয়টা নিয়ে বেশি হৈচৈ করার কোন প্রয়োজন নেই।

গণিত প্রতিযোগিতায় আমাকে ঢোকাতে না পেরে প্রিয়াংকা খুব মন খারাপ করল, তার ধারণা আমি যদি কোনভাবে সেখানে যেতে পারি তাহলেই একটা ফাটাফাটি কিছু করে ফেলতে পারব। আমার অবশ্য এমন কিছু মন খারাপ হলো না- অনেক দিন থেকেই এসব জিনিস থেকে আমি অনেক দূরে চলে গেছি। আগে আমি খুব ভাল ডিবেট করতাম এখন শুদ্ধভাবে কথাই বলতে পারি না।

তবে প্রিয়াংকা আমাকে নিয়ে হাল ছাড়লো না। স্কুল ছুটির পর প্রতিদিন প্রিয়াংকা আমার সাথে হেঁটে যেতে শুরু করলো। হেঁটে হেঁটে সে আমাকে নানারকম উপদেশ দিতো- তার উপদেশ যে খুব কাজের উপদেশ তা নয়, কিন্তু একজন মানুষ আমার জন্যে চিন্তাভাবনা করছে, আমাকে নিয়ে ভাবছে সেটাই আমার জন্যে অনেক কিছু। বিকালবেলা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার সাথে আমার এ ধরনের কথাবার্তা হতো :

"বুঝলি তপু কখনো হাল ছেড়ে দিবি না। সব সময় বুকের মাঝে আশা ধরে রাখবি।"

আমি বলতাম "রাখব।"

"বড় কিছু করতে হলে বড় কিছু স্বপ্ন দেখতে হয়।"

"ও।"

"তোকেও বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। বুঝেছিস?"

"বুঝেছি।"

"শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে। তোকে নিয়মিত খেলাধুলাও করতে হবে।"

"ও।"

"শুধু অংকে ভাল করলে হবে না। সব সাবজেক্টে ভাল করতে হবে।"

"ও।"

"সব সাবজেক্ট মন দিয়ে পড়তে হবে।"

"আচ্ছা।"

"দেরি করে ঘুমাবি না। ভাল শরীরের জন্যে ঘুম খুব দরকার।"

"ও।"

"আর তোর একা একা থাকার অভ্যাস ছাড়তে হবে।"

"তাই নাকি?"

"অবশ্যই। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা এতো সুইট অথচ তোর কোন বন্ধু নেই।"

আমি বললাম, "কে বলেছে বন্ধু নাই! তুই আছিস।"

"আর কে আছে?"

"আমার আরেকজন বন্ধুর নাম মিচকি।"

"মিচকি?" প্রিয়াংকা ভুরু কুঁচকে বলল, "ফাজলামি করবি না।"

"খোদার কসম।" আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তোর সাথে একদিন পরিচয় করিয়ে দেবো। ভয় পাবি না তো?"

"ভয় পাব কেন?"

"অনেকে ইঁদুরকে ভয় পায় তো!"

"ইঁদুর?" প্রিয়াংকা মুখ বিকৃত করে বলল, "ছিঃ! মাগো ঘেন্না!"

"মিচকি মোটেও সেরকম ইঁদুর না। খুব লক্ষী। প্রত্যেকদিন রাত দশটার সময় আমার কাছে বেড়াতে আসে।"

আমি প্রিয়াংকাকে মিচকি সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলি কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় না, প্রিয়াংকা মুখ বিকৃত করে বলে, "ছিঃ! মাগো ঘেন্না!"

আমি টের পেলাম খুব ধীরে ধীরে আমার একটা পরিবর্তন হলো। আমি নিজেকে খুব খারাপ ভাবতে শুরু করেছিলাম সেটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে শুরু করল। আমি পড়াশোনা শেষ করে একজন বড় ম্যাথমেটিশিয়ান হতে পারব সেটাও আজকাল খুব অসম্ভব মনে হয় না। প্রিয়াংকা বড় মানুষের মতো অনেক উপদেশ দেয়, বেশিরভাগ উপদেশই হাস্যকর তবে একটা উপদেশ মনে

হয় সত্যি। নিজের ওপরে বিশ্বাস রাখা খুব জরুরি, খুব আস্তে আস্তে মনে হয় আমার নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে আসছে।

যেমন সেদিন সকালে আমি প্রিয়াংকার গণিত বইটাতে একটা সিরিজ খুঁজে পেলাম যেটার যোগফল দুটো ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা হতে পারে। একভাবে যোগ করলে এক রকম অন্যভাবে যোগ করলে অন্য রকম, আমি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ ভাইয়া আমাকে ডাকতে শুরু করল। আমি উঠে ভাইয়ার ঘরে গেলাম। ভাইয়া কলেজে যাবার জন্যে কাপড় পরছে, আমাকে একটা প্যান্ট ছুড়ে দিয়ে বলল, "তপু এই প্যান্টটা আমাকে ইস্ত্রি করে দে দেখি।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না।"

ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, "না? ইস্ত্রি করে দিবি না?"

"না।"

"কেন?"

আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না কিন্তু আজকে কী হলো কে জানে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে উত্তর দিলাম। একেবারে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "তিনটা কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে আমি ব্যস্ত, পড়াশোনা করছি। দ্বিতীয় কারণ প্যান্ট ইস্ত্রি করা এমন কিছু কঠিন না। তোমার নিজের শার্ট-প্যান্ট তুমি নিজে ইস্ত্রি করবে, অন্যকে করে দিতে বলবে না। তৃতীয় কারণ, আমি তোমার ছোট ভাই। তুমি আমাকে বেতন দিয়ে তোমার শার্ট-প্যান্ট ইস্ত্রি করে দেয়ার জন্যে রাখ নাই।"

ভাইয়া বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, প্রথমে অবাক হলো তারপর আস্তে আস্তে রেগে উঠতে লাগলো। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তোর বেশি সাহস হয়েছে?"

আমি এবারেও একটা ফাটাফাটি উত্তর দিয়ে দিলাম, প্রিয়াংকার সাথে সাথে থেকে আমিও মনে হয় কথা বলা শিখে যাচ্ছি! বললাম, "উঁহুঁ। আমার বেশি সাহস হয় নাই, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু হয়েছে।"

ভাইয়া তখন যেটা করবে বলে ভাবছিলাম সেটাই করল, গলা উচিয়ে আম্মুকে ডাকল। বলল, "আম্মু! তপু আমার প্যান্ট ইস্ত্রি করে দিচ্ছে না!"

আম্মু অফিসে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছিলেন সেইভাবে ভাইয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। কোন কথা না বলে আমার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে গালে একটা চড় দিলেন, তারপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে মারার জন্যে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। আমার কপাল ভাল ভাইয়ার বেল্টগুলো কাছাকাছি কিছু নেই– টেবিলে তার রুলারটা পেয়ে গেলেন, শক্ত লোহার রুলার কিন্তু সাইজে ছোট

বলে মারতে খুব অসুবিধে। সেটা দিয়েই মারতে লাগলেন। আমি সাবধানে থাকার চেষ্টা করলাম তারপরেও একটা মুখে লেগে গেলো এবং আমার ঠোঁটটা কেটে গেল, আম্মু হঠাৎ করে থেমে গেলেন দেখে বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই অনেকখানি কেটেছে। আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে বললেন, "বেশি সাহস হয়েছে তোর?"

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আম্মু বললেন, "এই মুহূর্তে রাজীবের প্যান্ট ইস্ত্রি করে দে।"

আমি মাথা নেড়ে ভাইয়ার প্যান্টটা তুলে নিলাম। আম্মুর অফিসের গাড়ি চলে এসেছে বলে আম্মুকে চলে যেতে হলো। আমি খুব যত্ন করে ভাইয়ার প্যান্টটা ইস্ত্রি করলাম, আমার কাটা ঠোঁট থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, সেগুলো যেন তার প্যান্টে না পড়ে সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকলাম। প্যান্টটা ইস্ত্রি করে আমি সেটা দুই হাতে ধরে ভাইয়ার দিকে এগিয়ে দিলাম, ভাইয়া প্যান্টটা হাতে নিয়ে বলল, "পাখা কোথাকার, আমার কথা শুনলে তোর এরকম মার খেতে হতো না!"

আমি রক্তমাখা মুখে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, বললাম, "কিন্তু তোমার কথা আমি শুনব না! যতবার তোমার প্যান্ট ইস্ত্রি করতে হবে ততবার তোমাকে আম্মুকে দিয়ে আমাকে পিটাতে হবে। বুঝেছ?"

ভাইয়া কেমন যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, আমি একেবারে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, আর কী আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত ভাইয়া তার চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি দেখলাম তার চোখে আমার জন্যে ঘেন্না আছে সত্যি কিন্তু তার সাথে সাথে সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিস যোগ হয়েছে, সেটা হচ্ছে ভয়। হঠাৎ করে ভাইয়া আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে। কী আশ্চর্য!

মুখে কাটাকাটি থাকলে, মারের চিহ্ন থাকলে আমি সাধারণত এক দুইদিন স্কুলে যাই না কিন্তু আজকে আমি স্কুলে গেলাম। ঠোঁটটা শুধু যে খারাপ ভাবে কেটেছে তা না, বেশ ফুলেও উঠেছে। আমাকে দেখে ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে সরে গেলো, আমি আমার জায়গায় গিয়ে বসলাম। দূর থেকে প্রিয়াংকা আমাকে দেখে এগিয়ে এলো, কছে এসে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোর ঠোঁটটাকে দেখাচ্ছে পাখির ঠোঁটের মতো।"

হাসতে গিয়ে আমার ঠোটে ব্যথা করে উঠল বলে আমি ঠিক করে হাসতে পারলাম না, বললাম, "ফাজলেমি করবি না।"

প্রিয়াংকা মাথাটা আরেকটু কাছে এনে বলল, "আজকে কী দিয়ে মেরেছেন?"

"লোহার রুলার।"

"ইস! প্রিয়াংকার মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কেন?"

আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, "কারণ ছিল।"

প্রিয়াংকা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোকে দেখে মনে হচ্ছে মার খেয়ে তোর খুব মজা হয়েছে। হাসছিস বোকার মতো।"

আমি সাবধানে আমার ফুলে ওঠা ঠোঁটটা একবার ছুঁয়ে বললাম, "আসলেই আজকে একটু মজা হয়েছে। আমার ভাইয়া আজকে আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমার সারা মুখে রক্ত তখন আমি যখন ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে ভিলেনের মতো হাসলাম তখন তার জান শুকিয়ে গেছে!"

প্রিয়াংকা নিশ্চয়ই আমাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করতো কিন্তু ঠিক তখন কাছাকাছি আরও কয়েকজন চলে আসায় আর শুরু করতে পারল না।

ভাইয়ার সাথে সেই ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে ভাইয়া আর কখনও আমাকে তার শার্ট-প্যান্ট ইস্ত্রি করে দেয়ার কথা বলে না। তাই বলে আমার যে কাজ কমেছে তা নয়। আজকাল মাঝে মাঝেই আমাকে বাথরুম ধুয়ে দিতে হয়। একদিন বাসার সবগুলো বই থেকে ধুলা ঝাড়তে হলো– এই কাজটা অবশ্যি খুব খারাপ না, বসে বসে অনেক দিন পর বইগুলো দেখতে পারলাম। যখন সবকিছু ঠিক ছিল তখন আব্বু আর আম্মু আমাকে অনেক বই কিনে দিতেন, বেশিরভাগ বইয়ে আম্মুর হাতে লেখা 'সোনামনি তপুকে আম্মু' দেখে আমার চোখে হঠাৎ করে পানি এসে যায়। আমার আজকাল দুলি খালাকেও সাহায্য করতে হয়। দুলি খালার যে সাহায্য দরকার তা নয়, আম্মুর ধারণা আমাকে নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। আম্মু যদি ধারেকাছে না থাকেন তাহলে দুলি খালা আমাকে কিছু করতে দেয় না। তবে কিছু কিছু কাজ আমার খারাপ লাগে না, দুলি খালাকে দেখে দেখে আমি মোটামুটি রান্না শিখে গিয়েছি। রান্নাঘরে অবশ্যি অনেক মজার মজার ঘটনা দেখা যায়, যেমন গরম ডেকচিতে এক ফোঁটা পানি দিলে সেটা সাথে সাথে বাষ্পীভূত না হয়ে রীতিমতো জীবন্ত একটা প্রাণীর মতো ডেকচিতে ছোটাছুটি করতে থাকে। পেঁয়াজ কাটার সময় নাক চেপে ধরে রেখে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে চোখে পানি আসে না, একটা ভাতের সাথে দুই ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে ভাল করে কচলে একটু লবণ দিলে লবণটা বেগুনি হয়ে যায়– এই রকম নানা ধরনের মজার মজার জিনিস আমি রান্নাঘরেই আবিষ্কার

করেছি! দুলি খালাকে আমি বলেছি যে রান্নাঘর আসলে বিরাট একটা ল্যাবরেটরি, সেটা শুনে তার সে কী হাসি।

সবকিছু মিলিয়ে আমার সময়টা এখন আগের থেকে একটু ভাল কারণ আমি মোটামুটি নিয়মিতভাবে পড়াশোনা শুরু করেছি। এই প্রথমবার আমার সবগুলো বই আছে, যেগুলো ছিল না প্রিয়াংকা সেগুলো জোগাড় করে দিয়েছে। শুধু যে বইগুলো জোগাড় করেছে তা না প্রত্যেক দিন আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কী কী পড়েছি। আমার সেটা ভালই লাগে তবে আমি সেটা স্বীকার করি না, ভান করি খুব বিরক্ত হচ্ছি!

আমরা গণিত প্রতিযোগিতার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, স্কুল থেকে কয়েকজনের নাম পাঠানোর পর আর কোন সাড়াশব্দ নেই, তাই আমরা ধরে নিয়েছি এটা আসলে হচ্ছে না। কবিতা আবৃত্তি, ডিবেট কিংবা গানের প্রতিযোগতা হতে পারে কিন্তু গণিতের প্রতিযোগিতাটা আবার কেমন করে হবে? আর সত্যিই যদি হয় কার মাথা খারাপ হয়েছে কাগজ-কলম নিয়ে সেখানে হাজির হবার?

কিন্তু হঠাৎ করে খবরের কাগজে গণিত প্রতিযোগিতার খবর ছাপা হতে শুরু করল। বিভিন্ন স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা সেখানে আসবে, সারাদিন ধরে প্রতিযোগিতা, বিকেলে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে! পৃথিবীতে কতো রকম পাগল যে আছে, যারা এর আয়োজন করছে তাদের নিশ্চয়ই খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই!

গণিত প্রতিযোগিতার আগের দিন ক্লাসের শুরুতে প্রিয়াংকাকে দেখা গেল খুব উত্তেজিত, কোন একটা কারণে তার চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। সে ক্লাসের সামনে দাড়িয়ে চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগলো, "সবাই শুনো। জরুরি ঘোষণা। জরুরি ঘোষণা।"

ক্লাসের অন্য যে কোন ছেলে বা মেয়ে এভাবে জরুরি ঘোষণা দেওয়ার চেষ্টা করলে কেউ তাকে পাত্তা দিতো না। কিন্তু প্রিয়াংকার যে একটু মাথা খারাপ সেটা এতদিনে সবাই জেনে গেছে, তার নানারকম পাগলামীর জন্যে সবাই তাকে নিয়ে একদিক দিয়ে হাসাহাসি করে অন্যদিক দিয়ে পছন্দ করে! সবাই প্রিয়াংকার জরুরি ঘোষণা শোনার জন্যে কাছাকাছি এগিয়ে এলো।

প্রিয়াংকা হাত নেড়ে বলল, "গণিত প্রতিযোগিতার কথা তোদের মনে আছে?"

বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েরাই সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় নাই তাই তারা চিৎকার করে বলল, "না, মনে নাই।"

"মনে না থাকলে শোন! আমাদের স্কুলের সব ক্লাস থেকে তিনজনের নাম পাঠানো হয়েছে, মনে আছে?"

অনেকেই এবারে মাথা নাড়ল। প্রিয়াংকা বলল, "কিন্তু আমাদের ক্লাসে তিনজন থেকে বেশি ছেয়ে-মেয়ে অঙ্কে খুব ভাল। সেইজন্যে আমি ভাবছিলাম আমাদের ক্লাস থকে আরো বেশি ছেলে-মেয়ে পাঠানো দরকার!"

ভাল করে প্রিয়াংকার কথা শোনার জন্যে আমি এবারে একটু এগিয়ে গেলাম। প্রিয়াংকা বক্তৃতা দেওয়ার মতো করে হাত-পা নেড়ে বলল, "আমি পত্রিকায় এই গণিত প্রতিযোগিতার কমিটির ঠিকানা দেখে তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

আমরা অবাক হয়ে বললাম, "সত্যি?"

"সত্যি।" প্রিয়াংকা যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গি করে বলল, "আমি কমিটির প্রেসিডেন্টকে বলেছি আমাদেরকে আরো বেশি ছেলেমেয়েদের নাম দিতে হবে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "তখন তারা কী বলল?"

"প্রথমে তারা বলেছে রেজিস্ট্রেশনের সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তখন ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলাম।"

মৌটুসি জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে ঘ্যান ঘ্যান করলি?"

প্রিয়াংকা তখন অভিনয় করে দেখালো সে কেমন করে ঘ্যান ঘ্যান করেছে, দুই হাত জোড় করে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কান্না কান্না গলায় নেকু নেকু ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, "প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ..."

তার অভিনয়টা এতো মজার হলো যে দেখে আমরা সবাই হি হি করে হেসে ফেললাম। প্রিয়াংকা নিজেও হেসে ফেলল, বলল, "আমার ঘ্যান ঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে কমিটির প্রেসিডেন্ট বলল, "ঠিক আছে, বলো তোমার আর কতোজন দরকার?" আমি বললাম "চল্লিশজন–" সেটা শুনে প্রেসিডেন্টের হার্ট এটাকের মতো অবস্থা! সে বলল, "দুইজন" আমি বললাম, "তিরিশজন" সে বলল, "তিনজন" এইভাবে শেষ পর্যন্ত মুলামুলি করে দশজনে রাজি করিয়েছি!" প্রিয়াংকা তখন বিজয়ীর মতো ভঙ্গি করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়ালো এবং আমরা সবাই হাততালি দিলাম।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "কোন দশজন?"

"আমার তক্ষুণি রেজিস্ট্রেশান করাতে হবে, তাই যার যার নাম মনে এসেছে লিখে দিয়ে এসেছি। পাঁচজন ছেলে আর পাঁচজন মেয়ে।" প্রিয়াংকা তার ব্যাগ থেকে কিছু কাগজ বের করে বলল, "এই যে রেজিস্ট্রেশান কার্ড। কালকে কম্পিটিশনের সময় এই কার্ড সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

প্রিয়াংকা একজন একজন করে দশজনের নাম পড়ে তাদেরকে কার্ডটা দিয়ে দিল। সে যখন আমার নামটা পড়লো সবাই বিস্ময়ের একটা শব্দ করল, আমার মতো একজন ছেলে যে এরকম প্রতিযোগিতায় যেতে পারে কেউ সেটা বিশ্বাসই করতে পারে না। সবাই ভাবল এটা এক ধরনের রসিকতা, আমিও সেরকম ভান করে কার্ডটা নিলাম। কেউ জানে না, শুধু আমি জানি, আমাকে প্রতিযোগিতায় নেবার জন্যে প্রিয়াংকা এতো পরিশ্রম করেছে! আমি এই মেয়েটাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই দশজনের ভিতরে প্রিয়াংকার নিজের নাম নাই কেন শিউলি সেটা জানতে চাইল। প্রিয়াংকা তখন দাঁত বের করে হেসে বলল, "অঙ্ক আমি দুই চোখে দেখতে পারি না।" সবাই তখন প্রতিবাদের মতো একটা শব্দ করতেই প্রিয়াংকা হাত তুলে সবাইকে শান্ত করে বলল, "কিন্তু ভাবিস না আমি ফাঁকি দেব। আমি কালকে কম্পিটিশনে থাকব ভলান্টিয়ার হিসাবে।" প্রিয়াংকা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার উৎসাহ দেখে কমিটির প্রেসিডেন্ট আমাকে ভলান্টিয়ার বানিয়ে দিয়েছে।"

কম্পিটিশান

পরের দিন গণিত প্রতিযোগিতায় গিয়ে আমার আক্কেল গুড়ুম। বিয়ে বাড়ির মতো একটা গেট বানানো হয়েছে, তার কাছে একটা ব্যান্ডপার্টি। প্যাঁ প্যাঁ করে কয়েকজন ব্যাগ পাইপ বাজাচ্ছে তার সাথে ঢোল। ভিতরে ছোট ছোট স্টল, সেখানে মেলার মতো আয়োজন। কোথাও গণিতের বই কোথাও বিজ্ঞানের বই। এক জায়গায় গণিতের ধাঁধা, সঠিক উত্তর বলতে পারলেই পুরস্কার! আমার ধারণা ছিল অঙ্কের মতো নীরস একটা বিষয়ের প্রতিযোগিতায় আর কতজন আসবে? কিন্তু ভিতরে ঢুকে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, ছোট ছোট চশমা পরা ছেলে-মেয়েরা হাতে প্লাস্টিকের রুলার আর জ্যামিতি বক্স নিয়ে গম্ভীরভাবে ঘোরাঘুরি করছে। বিশাল একটা প্যান্ডেল, তার নিচে সারি সারি চেয়ার পাতা, সবাই সেখানে বসে যাচ্ছে। আমি প্রিয়াংকাকে খুঁজলাম, যারা ভলান্টিয়ার তারা নীল রংয়ের টি শার্ট পরে ব্যস্ততার ভান করে ঘোরাঘুরি করছে। আমি তাকে খুঁজে পেলাম না।

সাড়ে নয়টার সময় শুরু হবার কথা, আমি লিখে দিতে পারি সাড়ে দশটার এক মিনিট আগেও শুরু করতে পারবে না। আমার হাতে ঘড়ি নেই, আমি পাশের ছেলেটার হাতে দেখলাম সাড়ে নয়টা বেজে গেছে। শুরু না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই, তাই আমি মাত্র চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছি তখন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলো। বুড়ো এবং রাগী রাগী চেহারার কয়েকজন মানুষ স্টেজে এসে বসেছে, আমি গুনে দেখলাম নয়জন। এই নয়জনের সবাই বক্তৃতা দিবে, কমপক্ষে দশ মিনিট করে। নয় দশে নব্বই মিনিট, তার মানে পাকা দেড় ঘন্টা! মানুষের বক্তৃতার মতো খারাপ জিনিস আর কিছু নেই, এখন পাকা দেড় ঘন্টা এই রাগী রাগী চেহারার মানুষগুলোর বক্তৃতা শুনতে হবে ভেবে মনটাই খারাপ হয়ে গেলো।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে হালকা-পাতলা একটা মেয়ে। মেয়েটা খুব হাসিখুশি, সবসময়েই হাসছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বলছে যে দেখে মনে হয় সুন্দর করে কথা বলার মতো সহজ কাজ আর কিছুই নয়!

প্রিয়াংকা যখন বড় হবে, তখন নিশ্চয়ই এভাবে কথা বলবে। মেয়েটা গণিত প্রতিযোগিতার নিয়মকানুনগুলো বলে দিয়ে রাণী চেহারার একজনকে ডাকলো প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ঘোষণা করতে। রাণী চেহারার মানুষটি কোন একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সে এসে দুই এক কথা বলে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে দিল! কী আশ্চর্য ব্যাপার– আর কোন বক্তৃতা নাই। স্টেজে বসে থাকা আরো আটজন রাণী রাণী চেহারার বুড়ো মানুষগুলো নিশ্চয়ই খুব রাগ হয়েছে যে তাদের বক্তৃতা দিতে ডাকছে না কিন্তু ততক্ষণে সব ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে কম্পিটিশনে অঙ্ক করার জন্যে তাদের ঘরের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। এখন তারা বক্তৃতা দিলেও কেউ শুনবে না। হালকা-পাতলা মেয়েটা যে কাউকে বক্তৃতা দিতে দেয় নাই সে জন্যে আমার ইচ্ছে হলো তাকে এক স্টিক চুইংগাম দিয়ে আসি!

আমরা সবাই ক্লাস রুমে বসে আছি, আমার ডানদিকে অসম্ভব মোটা একটা ছেলে, বাম দিকে চশমা পরা শ্যামলা রংয়ের একটা মেয়ে। আমাদের স্কুলের অন্য ছেলে-মেয়েরা কোথায় বসেছে আমি জানি না, আশেপাশে কাউকে দেখছি না। আমাদের রুমটা বেশ বড়– সব মিলিয়ে প্রায় একশ' জন ছেলে-মেয়ে এসে বসেছে। অঙ্ক কম্পিটিশনটা কীরকম হবে সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই, তাই ধৈর্য ধরে বসে আছি।

এরকম সময় ঘণ্টা পড়ল এবং সাথে সাতে ক্লাস রুমের শিক্ষকেরা সবার হাতে একটা করে খাতা আর প্রশ্ন দিতে লাগলো। আমার ডান পাশের মোটা ছেলেটা চোখ বন্ধ করে একটা দোয়া পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দিল, তারপর প্রশ্নটা এবং হাতের কলমটাকে একটা চুমু খেয়ে মাথায় লাগালো। বাম পাশের মেয়েটা অবশ্যি দোয়া দরুদের মাঝে গেল না, সরাসরি অঙ্ক কষার মাঝে লেগে গেলো। আমিও আমার প্রশ্নটার দিকে তাকালাম। দুই ঘণ্টা সময়, তার মাঝে দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো বাংলা আর ইংরেজিতে, ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলে-মেয়েরাও যেন আসতে পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

আমি প্রশ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম– প্রশ্নগুলো একবারেই সোজা– একবার সন্দেহ হলো ভুল করে অন্য কোন ক্লাসের প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছে কী না কে জানে! ভাল করে দেখলাম, আমাকে ঠিক প্রশ্নই দিয়েছে। এতো হৈচৈ করে গণিত প্রতিযোগিতা করছে—কিন্তু এরকম সোজা বাচ্চা পোলাপানের প্রশ্ন দিলো ব্যাপারটা কী? আমি ডানে-বামে সামনে-পিছনে তাকালাম, নাহ্, অন্য সবাই তো দেখি পেন্সিল কামড়ে কামড়ে গম্ভীর মুখে অঙ্ক করতে শুরু করেছে, মনে হয় প্রথম দিকে সোজা প্রশ্নগুলো দিয়ে শেষের দিকে কঠিন প্রশ্ন দিয়েছে।

আমি শেষের প্রশ্নগুলো দেখলাম– আসলেই কঠিন! শুধু কঠিন না একেবারে ফাটাফাটি কঠিন। আমি কঠিন প্রশ্নটা পড়ে একটু হকচকিয়ে গেলাম– প্রশ্নটা কঠিন হতে পারে কিন্তু খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন। শুধু প্রশ্নটা পড়েই আমার বুকটা ভরে গেলো, যারা এইরকম চমৎকার একটা প্রশ্ন করতে পারে তাদের মাথায় না জানি কতো বুদ্ধি! আগে সোজা প্রশ্নগুলো শেষ করে কঠিন প্রশ্নটা ধরা উচিত কিন্তু আমার যে কী হলো আমি কঠিন প্রশ্নটার উত্তর বের করতে শুরু করলাম।

আসল প্রশ্নটার উত্তর বের করার আগে আমার অন্য দুই একটি জিনিস প্রমাণ করতে হলো, সেগুলো প্রমাণ করার জন্যে আরো কয়েকটা জিনিস প্রমাণ করতে হলো। সবগুলো প্রমাণ শেষ করে যখন আসল সমস্যাটা করতে শুরু করেছি তখন মাঝামাঝি এসে আটকে গেলাম। শেষ পর্যন্ত কী ভাবে করতে হবে যখন হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম তখন আমার যা আনন্দ হলো সেটা বলার মতো নয়! ঝটপট পুরোটা শেষ করে, আমি অন্য সমস্যাগুলো করতে বসলাম। মাত্র প্রথমটা শুরু করেছি তখন দেখি কে যেন আমার খাতাটা ধরে টানছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি হলের গার্ড, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"সময় শেষ।"

সময় শেষ মানে? আমি চমকে উঠলাম, প্রশ্নের উপর স্পষ্ট লেখা আছে সময় দুই ঘণ্টা। আমি বললাম, "দুই ঘণ্টা সময় না?"

"হ্যাঁ। দুই ঘণ্টা শেষ।"

"দুই ঘণ্টা শেষ?" আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, "দুই ঘণ্টা কী ভাবে শেষ হলো?"

গার্ড মুচকি হেসে বলল, যখন সময় খুব ভাল কাটে তখন কীভাবে যে সময় চলে যায় কেউ জানে না!" তারপর হা হা করে হেসে উঠল, যেন খুব একটা উঁচু দরের রসিকতা করেছে।

আমার খাতাটা টেনে নিয়ে চলে যেতে যেতে মানুষটা ফিরে এলো, বলল, "কী ব্যাপার খাতায় দেখি নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর কিছুই লিখ নি?"

মানুষটা নাম লেখার জন্যে খাতাটা ফিরিয়ে দিল– একবার ভাবলাম লিখব না– লিখে লাভ কী? কিন্তু মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তাই লিখতে হলো।

পরীক্ষার হল থেকে বের হতেই আমার প্রিয়াংকার সাথে দেখা হলো, সে এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে কোথায় জানি ছুটে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলো, চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো, "কেমন হয়েছে?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, "না, মানে ইয়ে– হঠাৎ করে দেখি সময় শেষ হয়ে গেল।"

"কয়টা করেছিস?"

"এ-একটা।"

প্রিয়াংকার মুখটা দপ করে নিভে গেলো। শুকনো মুখে বলল, "মাত্র একটা? সবাই যে বলছে খুব সোজা হয়েছে প্রশ্ন?"

"হ্যাঁ মানে ইয়ে–" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। ইচ্ছে হলো নিজের পিছনে একটা লাথি মারি! যদি শুধু সোজা প্রশ্নগুলো দিয়ে শুরু করতাম তাহলে আমিও অনেকগুলো করে ফেলতে পারতাম।

প্রিয়াংকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যাই হোক। পরের বার ভাল করে করবি। আমি এখন যাই– এই কাগজগুলো এখনই নিয়ে যেতে হবে।"

প্রিয়াংকা হাতের কাগজের বান্ডিল নিয়ে ছুটে যেতে শুরু করল। ভলান্টিয়ারদের জন্যে আলাদা ভাবে তৈরি করা নীল রংয়ের একটা টি শার্ট পরেছে, বুকের মাঝে নাম লেখা ব্যাজ, খুব মানিয়েছে তাকে! দেখে মনে হচ্ছে তার জন্মই হয়েছে ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্যে!

আমি মন খারাপ করে প্যান্ডেলের নিচে এসে দাঁড়ালাম। সবাই একজনের সাথে আরেকজন কথা বলছে, কার কয়টা হয়েছে বোঝার চেষ্টা করেছে। যখনই একটার উত্তর মিলে যাচ্ছে তখনই তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, যখন মিলছে না তখন মুখটা কালো করে ফেলেছে! আমিই শুধু একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম। জয়ন্ত মামুন আর মৌটুসিকে দেখলাম কথা বলতে বলতে আসছে, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলো। মামুন ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "হয়েছে একরকম।"

"কয়টা হয়েছে?"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "একটা।"

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তারা হাসি গোপন করল। জয়ন্ত ভদ্রতা করে বলল, "ও, আচ্ছা।"

আমি জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কয়টা হয়েছে?"

"পাঁচটা কনফার্ম। ছয় নম্বরটা কারো কারো সাথে মিলছে কারো কারো সাথে মিলছে না।"

"ও।"

জয়ন্ত, মামুন আর মৌটুসি তখন জুস খেতে খেতে চলে গেলো। আমার খেয়াল হলো আমার হাতেও একটা জুস, যারা আজকে কম্পিটিশনে অংশ

নিয়েছে সবাইকে এক প্যাকেট করে জুস দিয়েছে। আমি মনমরা হয়ে আমার জুসের প্যাকেটটা খুলে জুস খেতে লাগলাম।

দুপুরে এক ঘন্টা বিরতি, তারপরে ব্ল্যাকহোলের ওপর একটা বক্তৃতা তারপর পুরস্কার বিতরণী। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমার থাকার কোন ইচ্ছে নেই, কিন্তু ব্ল্যাক হোল নিয়ে কী বলে একটু শোনার ইচ্ছে আছে। তাই বক্তৃতাটা শোনার জন্যে থেকে গেলাম– সকালে রাণী চেহারার একজন বুড়োমতো মানুষ ব্ল্যাক হোল নিয়ে বিশাল একটা বক্তৃতা দিলো। মানুষটার উৎসাহ খুব বেশি এমন ভাবে কথা বলতে লাগলো যেন সে নিজেই টিপে টুপে ব্ল্যাক হোল তৈরি করেছে। বক্তৃতা দিতে দিতে মাঝে মাঝে সে রসিকতা করার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেগুলো খুব কাজে এলো না। এক দুইজন ভদ্রতা করে একটু হাসার চেষ্টা করলো কিন্তু বেশির ভাগই মুখ শক্ত করে বসে থাকলো।

ব্ল্যাক হোলের উপর বক্তৃতাটা যত ভাল হবে ভেবেছিলাম সেটা তত ভাল হলো না। আমি মাঝখানেই উঠে যেতাম কিন্তু বসেছি একেবারে মাঝখানে, বের হওয়া খুব কঠিন।

বক্তৃতাটা শেষ হবার সাথে সাথে আমি বের হয়ে দেখি চারপাশে মিলিটারি, বের হওয়ার গেটটাও বন্ধ করে দিয়েছে, কাউকে বের হতে দিচ্ছে না। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম পুরস্কার দেওয়ার জন্যে প্রেসিডেন্ট আসছেন বলে এরকম কড়াকড়ি। যারা ভিতরে আছে তারা এখন আর বের হতে পারবে না।

আমি আর উপায় না দেখে পিছনের দিকে একটা চেয়ারে বসলাম। আস্তে আস্তে পুরো প্যান্ডেলটা ভরে গেলো। এদিকে সেদিকে মিলিটারি তাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্টেজটা সুন্দর করে সাজিয়েছে, সেখানে মেডেলগুলো এনে রেখেছে। সকালবেলা যে মেয়েটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিল সেই মেয়েটাকে আবার দেখলাম ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। আমি বসে প্রিয়াংকাকে খুঁজলাম কিন্তু এত ভিড়ে তাকে আমি খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ করে চারিদিকে একটু ব্যস্ততা দেখা গেলো সবাই হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়। তখন আমি দেখতে পেলাম কয়েকজন মিলিটারি প্রায় ঘেরাও করে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আসছে। একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া নিশ্চয়ই খুব কষ্টের ব্যাপার—শান্তিমতো কোথাও যেতেও পারে না, সব সময় তাদের আগে-পিছে গোটা দশেক মিলিটারি ঘুরঘুর করতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট আসার সাথে সাথে তাকে নিয়ে বেশ কয়েকজন স্টেজে উঠে গেলো। সকালে বক্তৃতা দিতে পারে নি বলে যারা মন খারাপ করেছিল এখন

তাদের খুব উৎফুল্ল দেখা গেলো, মনে হয় এখন তারা সবাই লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবে। প্রেসিডেন্টদের সময় নিয়ে খুব টানাটানি থাকে তাই ঝটপট অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলো। হাসি-খুশি মেয়েটা আবার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে থাকে– সকালে সে অনেক হাসি-তামাশা করেছে এখন প্রেসিডেন্টের সামনে দরকারি কথা ছাড়া আর কোন কথা বলছে না। প্রথমে একজন এসে প্রেসিডেন্টের গুণগান গাইতে লাগলো, একজন প্রেসিডেন্ট এতো ব্যস্ত তারপরেও কষ্ট করে এখানে এসেছেন সেই জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সে মুখে প্রায় ফেনা তুলে ফেলল। তারপর আরেকজন দাঁড়িয়ে গণিত যে কতো গুরুত্বপূর্ণ সেটার ওপর বিশাল বক্তৃতা দিতে শুরু করল। আরেকজন দাড়িয়ে যারা আয়োজন করেছে তারা যে কতো মহৎ কাজ করেছে সেটার ওপর বিশাল একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। বক্তৃতাগুলো একই রকম, একই গলায় একই সুরে বলা হয় একটা শুনলেই মনে হয় সবগুলো শোনা হয়ে গেছে– আমি প্রায় অধৈর্য্য হয়ে গেলাম।

সবার শেষে প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তিনি অল্প কথায় বেশ গুছিয়ে বক্তৃতা দিলেন। গণিত কী রকম জরুরি, আজকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে ভবিষ্যতের বড় বড় বিজ্ঞানী হবে এরকম খুব ভাল ভাল কথা বললেন। বক্তৃতা শেষ হবার পর সবাই খুব জোরে জোরে হাততালি দিল– প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা শেষ করার পর মনে হয় জোরে জোরে হাততালি দেওয়ার নিয়ম।

হালকা-পাতলা মেয়েটা বলল এখন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করার জন্যে গণিতের একজন প্রফেসরকে অনুরোধ করল। মানুষটার উস্কখুস্ক চুল, বড় বড় গোঁফ। মোটামুটি সেজেগুঁজে এসেছে তবু তার চেহারায় ভদ্রলোকের ভাবটা ফুটে ওঠে নি। মানুষটা স্টেজে উঠে প্রথমে গণিত কী রকম কঠিন সেটা নিয়ে একটা রসিকতা করল, কেউ একটুও হাসল না, তাতে একটা লাভ হলো, মানুষটা আর রসিকতা করার চেষ্টা না করে পুরস্কার নেওয়ার জন্যে একজন একজন করে ডাকতে লাগলো।

প্রথমে প্রাইমারি ক্লাস, তারপর জুনিয়র তারপর আমাদের গ্রুপ। সবশেষে কলেজ। দলভিত্তিক পুরস্কার, একক পুরস্কার। আমাদের স্কুল থেকে প্রাইমারি গ্রুপের একটা মেয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে গেলো— আমরা সবাই তখন জোরে জোরে হাততালি দিলাম।

সব পুরস্কার দেওয়া শেষ, এখন কেউ একজন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করে দেবে তারপর প্রেসিডেন্ট চলে গেলে আমারা বাসায় যেতে

পারব। ঠিক কী কারণ জানি না আমার ভেতরটা তেতো হয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিকভাবে হয় নি, কোনটা ঠিকভাবে হয় নি সেটা বুঝতে পারছি না বলেই মেজাজটা আরো বেশি খারাপ হয়ে আছে। উস্কখুস্ক চুলের গণিতের প্রফেসর তখন হঠাৎ এমন ভাব করল যেন তার কিছু একটা মনে পড়েছে। হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা এতক্ষণ প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চ্যাম্পিয়নদের পুরস্কার দিয়েছি। এখন আমাদের সর্বশেষ পুরস্কার চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন।"

আমি তখন লক্ষ করলাম সত্যিই টেবিলে এখনো একটা পুরস্কার রয়ে গেছে। গণিতের প্রফেসর হাত থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, "পুরস্কারটা যাবে সেকন্ডারি গ্রুপে। এই পুরস্কারটা পেয়েছে এমন একটা ছেলে যে এখনই আমার থেকে বেশি গণিত জানে! সব গ্রুপে আমরা একটা করে গণিতের সমস্যা দিয়েছি যেটা এতো কঠিন যে দুই ঘন্টার মাঝে করা সম্ভব নয়। সেকন্ডারি গ্রুপের এই অঙ্কটা আমি করেছি দুই দিনে, তাও অন্য অনেকের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু আজকে একজন ছেলে সেই অঙ্কটি করে ফেলেছে। আমাদের কম্পিটিশনে সবগুলো অঙ্কে যত মার্কস ছিল ঐ একটিতে ছিল তার দ্বিগুণ মার্কস! এই ছেলেটি আর কোন অঙ্ক স্পর্শ করে নি, সে শুধু ঐ একটি অঙ্ক করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাকে আমি মঞ্চে এসে চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বর্ণপদক নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি।"

ঠিক জানি না কেন হঠাৎ করে আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি শুনলাম উস্কখুস্ক চুলের গণিতের প্রফেসর বলছেন, "ছেলেটি বি.কে. হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আরিফুল ইসলাম তপু।"

দর্শকদের ভেতরে কে যেন চিলের মতো শব্দ করে চিৎকার করে উঠল আমি না দেখেই বুঝতে পারলাম সেটা প্রিয়াংকা। সে চিৎকার করেই যাচ্ছে, অন্যদের প্রচণ্ড হাততালিতে সেটা আর শোনা যাচ্ছে না তবু সে থামছে না। গণিতের প্রফেসর তখনো আমাকে খুঁজছেন, মাইকে বলছেন, "কোথায় আরিফুল ইসলাম তপু? রেজিস্ট্রেশন নম্বর সাত এক চার তিন?"

আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম আমার পাশে যারা বসেছিল তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। একজন হাত বাড়িয়ে জোরে জোরে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করল, অন্যেরা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে আমাকে মঞ্চে যাবার জন্যে জায়গা করে দিল। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে মঞ্চে যাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে সবকিছু যেন একটা অবাস্তব স্বপ্ন! চারপাশে সব কিছু কেমন যেন দুলতে লাগলো, আমি সব কিছু দেখেও দেখছি না। সবাই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে,

দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে, দিচ্ছে তো দিচ্ছেই, থামার কোন নাম-নিশানা নেই। আমি তার ভিতরে প্রিয়াংকার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, সে কোথায় আছে কে জানে?

আমাকে কয়েকজন মঞ্চে নিয়ে গেলো। প্রেসিডেন্ট আমাকে মেডেলটা পরিয়ে দিলেন, মনে হলো কয়েকশ' ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে উঠলো। সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের জন্যে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। আমাকে সার্টিফিকেট দেবার সময় প্রেসিডেন্ট সেটা কিছুক্ষণ ধরে রাখলেন যেন ক্যামেরাম্যানরা ভাল করে ছবি তুলতে পারে। তারপর প্রেসিডেন্ট আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন, মঞ্চে যারা বসে আছে তারাও দাঁড়িয়ে গেছে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্যে। আমার একজন একজন করে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করতে হলো, উস্কখুস্ক চুলের গণিতের প্রফেসর হ্যান্ডশেক করেই শান্ত হলেন না, আমার সাথে কোলাকুলি করে ফেললেন।

আমি যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসছি তখনও টেলিভিশনের ক্যামেরাগুলো আমার পিছনে পিছনে আসছে। প্যান্ডেলের মাঝামাঝি আসার পর দেখলাম কে যেন দর্শকদের ঠেলে আমার কাছে ছুটে আসছে। মিলিটারিরা তাকে থামানোর চেষ্টা করল, সে কনুই দিয়ে মিলিটারিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমার কাছে ছুটে এলো। মানুষটি যে প্রিয়াংকা সেটা আমি অনুমান করতে পারছিলাম। কাছে এসে আমাকে ধরে কী যেন বলতে লাগলো, আমি বুঝতে পারলাম না। তার শুধু ঠোঁট নড়ছে কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। চিৎকার করতে করতে সে তার গলা ভেঙ্গে ফেলেছে!

প্রেসিডেন্ট চলে যাবার পরও আমাকে বেশ কিছুক্ষণ প্যান্ডেলে থাকতে হলো। রাণী রাণী চেহারার বুড়ো মানুষগুলো সবাই এসে আমার সাথে কথা বলল, আমার নাম-ঠিকানা কাগজে লিখে নিল। সাংবাদিকরা আমার সাথে কথা বলল, আমি কী করি, কী খাই, কী পরি এরকম নানা রকম প্রশ্ন করলো। টেলিভিশনের লোকেরা আমার ইন্টারভিউ নিলো। কয়েকজন মা তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি নিলেন। প্রায় আমাদের বয়সী কয়েকটা মেয়ে তাদের খাতায় আমার অটোগ্রাফ নিয়ে আমার টেলিফোন নম্বর জানতে চাইলো। আমি টেলিফোন নম্বর দেবার সাহস করলাম না। জয়ন্ত, মামুন, মৌটুসি আর আমাদের স্কুলের অন্যেরাও আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা এমন ভাব করতে লাগলো যেন তারা সব সময়েই জানতো আমি অসাধারণ প্রতিভাবান। সাংবাদিকেরা যখন তাদের ইন্টারভিউ নিলো তারা বানিয়ে বানিয়ে আমার সম্পর্কে অনেকগুলো ভাল ভাল কথা বলে ফেললো!

বেচারি প্রিয়াংকা শুধু একটা কথাও বলতে পারল না। তার গলা দিয়ে একটা শব্দও বের হচ্ছে না।

আমি যখন বাসায় ফিরে এসেছি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি সাবধানে বাসার ভিতরে ঢুকলাম, আম্মু বসার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। সামনে টেলিভিশনটা খোলা, কিছু একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, আপু সেটা দেখছে। ভাইয়া মনে হয় তার ঘরে।

আমি নিঃশব্দে রান্নাঘরে এসে ঢুকলাম, দুলি খালা রান্না করছিল, মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল। আমি দুলি খালার কাছে গিয়ে পকেট থেকে আমার গোল্ড মেডেলটা বের করে দেখালাম, বললাম, "এই দেখো দুলি খালা।"

"এইটা কী?"

"মেডেল।"

"কই পাইছ?"

"আমাকে দিয়েছে।"

"কে দিল?"

"প্রেসিডেন্ট।"

দুলি খালা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কুন জায়গার প্রেসিডেন্ট?"

"কোন জায়গা মানে কী? বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট!"

স্বয়ং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে একটা মেডেল দিয়েছেন শুনেও দুলি খালার খুব একটা ভাবান্তর হলো না। সে মেডেলটা হাতে নিয়ে বলল, "কীসের মেডেল এইটা? পিতলের?"

আমি হেসে বললাম, "ধুর দুলি খালা! পিতল হবে কেন? এইটা সোনার মেডেল!"

"আসল সোনা?"

"হ্যাঁ। আসল। একটা দেশের প্রেসিডেন্ট কখনো নকল সোনা দেয় নাকী?"

দুলি খালার এইবার চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। মেডেলটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো, কতটুকু ওজন অনুমান করে বলল, "দুই ভরির কম না। কমপক্ষে দশ হাজার টাকা!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সোনার কতো দাম তুমি জানো?"

দুলি খালা মেডেলটা হাতে নিয়ে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো এবং খাঁটি সোনা আর নকল সোনার পার্থক্য কীভাবে ধরতে হয় সেটা নিয়ে কথা বলতে লাগলো। কেন এই মেডেলটা পেয়েছি জানার খুব এটা আগ্রহ দেখালো না। এক দিক দিয়ে ভাল, যদি আগ্রহ দেখাতো তাহলে দুলি খালাকে সেটা বোঝাতে পারতাম বলে মনে হয় না! নাচের কম্পিটিশন হয়, গানের কম্পিটিশন হয় এমন কী কবিতা আবৃত্তির কম্পিটিশন হয়। তাই বলে গণিতের কম্পিটিশন?

স্টোররুমে আমি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সার্টিফিকেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। মেডেলটা হাতে নিয়ে দেখলাম, তারপর সেগুলো তোশকের নিচে রেখে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। আম্মু, ভাইয়া কিংবা আপু কিছুই জানে না। কালকে নিশ্চয়ই খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হবে, সেই খবরটা পড়ে আম্মু কী করবে? ভাইয়া আর আপুইবা কী করবে? তাদের সবার ধারণা আমি একজন অপদার্থ খারাপ ছেলে। আমাকে দিয়ে কিছু হবে না! খবরের কাগজে যখন দেখবে বাংলাদেশে আমার মতো গণিত কেউ জানে না—আমি হচ্ছি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন তখন তারা কী করবে?

আমার সেই ছোটবেলার কথা মনে হলো। স্কুল থেকে ডিবেটের টিম গিয়েছে, আমিও আছি সেই টিমে! আম্মু আমাকে নিয়ে গেছেন, বসেছেন দর্শকদের সাথে। ডিবেটে যখন আমাদের টিম জিতে গেলো তখন আম্মুর সে কী হাততালি। মেডেলটা নিয়ে যখন এসেছি আম্মু আমাকে ধরে সবার সামনে দুই গালে চুমু খেয়ে ফেললেন! বাসায় যখনই কেউ এসেছে সাথে সাথে তাদের আমার সেই মেডেলটা দেখিয়েছেন, এখন আমি বাংলাদেশের গণিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, দেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে একটা গোল্ড মেডেল দিয়েছে কিন্তু আমি সেটা আম্মুকে বলতে পারছি না।

আম্মু আর আপু বসার ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছিল। এখন ভাইয়ার গলাও শুনতে পাচ্ছি, তিনজনে মিলে টেলিভিশনে খবর শুনছে। আজকে মনে হয় ক্রিকেট খেলা ছিল, ক্রিকেট খেলা নিয়ে বাসার সবার খুব উৎসাহ। যখনই ক্রিকেট খেলা হয় তখন সবাই মিলে সেটা দেখে। আমি অন্যমনস্কভাবে বসার ঘর থেকে টেলিভিশনের খবরের ছিটে ছোটা শুনছিলাম হঠাৎ ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠলাম। টেলিভিশনে আজকের গণিত প্রতিযোগিতার কথা বলছে! আমি পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত চলে এলাম ভাল করে শোনার জন্যে। দুলি খালা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, আমি ফিসফিস করে বললাম, "দুলি খালা, টেলিভিশনে আমাদের খবর বলছে।"

দুলি খালা তখন চুলো থেকে ডেকচিটা নামিয়ে হাত মুছে তাড়াতাড়ি বসার ঘরে গেলো খবর শুনতে। আমি দরজায় কান লাগিয়ে খবরটা শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। আবছা আবছা শুনতে পেলাম খবরে বলছে, "এই গণিত প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, আজকের শিশু-কিশোররাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার। তারাই একদিন বড় বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ হয়ে এই দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই গণিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে একমাত্র স্বর্ণপদকটি পেয়েছে হয় বি.কে. হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আরিফুল ইসলাম তপু।" খবর এক মুহূর্তের জন্যে থেমে যায় এবং অনেক মানুষের হাততালি শোনা যেতে থাকে, এখন নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে আমাকে গোল্ড মেডেলটি দেয়া হচ্ছে! ইস! আমি যদি একবার দেখতে পারতাম!

আবার কথা শোনা যেতে লাগলো, "অনুষ্ঠান শেষে একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাদের ক্ষুদে গণিতবিদ আরিফুল ইসলাম তপু জানান" আমি তখন হঠাৎ করে আমার নিজের গলার স্বর শুনতে পেলাম, আমি বলছি, "না মানে আমি কখনই ভাবি নাই আমি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হব। সবাই ছয়টা সাতটা করে অঙ্ক করেছে আমি করেছি মাত্র একটা! আমি বুঝি নাই আমি যেটা করেছি সেটা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তবে অঙ্কটা কঠিন হলেও খুব মজার অঙ্ক ছিল। আমার করতে খুব মজা লেগেছে।" আমার কথা যখন বলেছে তখন টেলিভিশনে নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়েছে— কেমন দেখাচ্ছিল কে জানে! ইস যদি একবার দেখতে পারতাম!

টেলিভিশনে আবার কথা শোনা যেতে লাগলো, "আমাদের ক্ষুদে গণিতবিদ আরিফুল ইসলাম তপু জানিয়েছে সে বড় হয়ে একজন সত্যিকার গণিতবিদ হতে চায়। সে জানায় তার সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে তার বন্ধুবান্ধব, তার স্কুলের শিক্ষক এবং অবশ্যই তার পরিবারের সদস্যরা।"

খবরের মানুষটি বলল, "এবারে খেলার খবর।" তখন একটা বাজনা বাজতে লাগলো– এখন মনে হয় বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে যাবে।

আমি কিছুক্ষণ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম, বসার ঘর থেকে আম্মু ভাইয়া বা আপুর কোন কথা শোনা যায় কী না সেটা শুনতে। কিন্তু কিছু শুনতে পেলাম না। সবাই নিঃশব্দে বসে আছে– এই মুহূর্তে কী ভবছে তারা? আমি নিঃশব্দে আবার স্টোররুমে আমার বিছানায় ফিরে এলাম।

অন্যদিন খাবার টেবিলে আম্মু ভাইয়া আর আপু হালকা গলায় একটু কথাবার্তা বলে আজকে আমি এটা কথাও শুনতে পেলাম না, একেবারে নিঃশব্দে তারা খেয়ে উঠে গেলো। আমি শুনতে পেলাম সবাই নিজের নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে।

ঠিক আধাঘণ্টা পরে বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। আমাদের বাসায় খুব বেশি কেউ আসে না- আম্মুর অফিসের লোকজন, ভাইয়া বা আপুর দুই একজন বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝে আসে। তারা অবশ্যি আরো আগে আসে- এখন একটু বেশি রাত হয়ে গেছে। কলিংবেল শুনে দুলি খালা দরজা খুলে দিয়েছে, আমি একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম কে এসেছে, কার কাছে এসেছে। কিছু বোঝার আগেই আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, রান্নাঘর হয়ে স্টোররুমে যে এসে হাজির তাকে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। ম্যাডামের হাতে একটা বিশাল ফুলের তোড়া।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম স্টোররুমে এসে চালের বস্তাটা ঠেলে সরিয়ে একটু জায়গা করে নোংরা মেঝেতে বসে পড়লেন। তাকে দেখে মনে হলো স্টোররুমের ছোট ঘুপচিতে ময়লা তোষক বিছিয়ে গুটিশুটি মেরে একজনের ঘুমানো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার— আর ফুলের তোড়া নিয়ে তার সাথে দেখা করতে আসা আরো স্বাভাবিক ব্যাপার। ম্যাডাম ফুলের তোড়াটা আমার বিছানায় রেখে বললেন, "টেলিভিশনে এই মাত্র তোমাকে দেখেছি। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মেডেলটা আমাকে দেখাও, নিজের চোখে না দেখলে আমার বিশ্বাস হবে না।"

আমি তখনও থতমত খেয়ে আছি। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেমন করে আমার বাসায় এতো রাতে চলে এলেন, কেন এলেন? বাসার কারো সাথে কথা না বলে এই স্টোররুমে কেন চলে এলেন! আমাদের এভাবে দেখে একটুও অবাক কেন হচ্ছেন না- কেন ভান করছেন এটাই স্বাভাবিক? আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "ম্যাডাম-আ-আপনি আমার বাসা চিনলেন কেমন করে ম্যাডাম?"

"যতদিন আমাদের ভ্রাম্যমাণ এনসাইক্লোপিডিয়া প্রিয়াংকা আছে ততদিন তোমার বাসা চেনা কোন সমস্যা নাকী?" প্রিন্সিপাল ম্যাডাম শব্দ করে হেসে বললেন, "আজ বিকেলে সে আমার বাসায় হাজির! শুধু লাফঝাঁপ দেয় আর ঠোঁট নাড়ায়- গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হয় না! শুধু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে শব্দ

হয়! অনেক কষ্ট করে আমাকে বুঝিয়েছে। তার সাথে বসে টেলিভিশনের নিউজ দেখে এখন আসছি!"

হঠাৎ করে আমার অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেন সোজা স্টোররুমে চলে এলেন, কেন আমাকে ময়লা তোষকের মাঝে গুটিশুটি মেরে বসে থাকতে দেখেও অবাক হলেন না- সব আমি বুঝে গেলাম। আমি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "প্রিয়াংকা কোথায় ম্যাডাম?"

"বাইরে ঘোরাঘুরি করছে! ভিতরে আসতে রাজি হলো না।"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার মাথায় হাত রাখলেন, তারপর নরম গলায় বললেন, "তপু, তুমি একা একা অনেক দূর চলে এসেছ। এরকম আমি কখনো দেখি নি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার আর একা একা যেতে হবে না। আমরা সবাই থাকব তোমার সাথে।"

আমি কোন কথা বললাম না। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন, তারপর স্টোররুম থেকে বের হয়ে গেলেন। বাইরে নিশ্চয়ই আম্মুর সাথে দেখা হলো কারণ শুনলাম প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই তপুর আম্মু? আমরা সবাই তপুকে নিয়ে খুব গর্বিত। এমন একটি সন্তানকে আপনি জন্ম দিয়েছেন— আপনি হচ্ছেন রত্নগর্ভা।"

আম্মু কিছু বললেন না। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, "অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। খবরটা শুনে আর বাসায় থাকতে পারলাম না।"

আম্মু এবারে অস্পষ্ট গলায় কী যেন বললেন। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, "আসি তাহলে?"

দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম- প্রিন্সিপাল ম্যাডাম নিশ্চয়ই চলে গেলেন। আমি দীর্ঘ সময় নিঃশব্দে আমার ঘরে বসে রইলাম, আমার শুধু মনে হতে লাগলো এক্ষুণি হয়তো আম্মু আমার ঘরে আসবেন- কিছু একটা বলবেন, কিন্তু আম্মু আসলেন না।

গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি আবছা অন্ধকারে আম্মু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আম্মুর হাতে একটা লোহার রড—হঠাৎ করে আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। আম্মুর চুল এলোমেলো,

চোখগুলো অন্ধকারেও ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে। আম্মু হিংস্র গলায় বললেন, "তোর সাহস বেশি হয়েছে তপু?"

আম্মু কিসের সাহসের কথা বলছেন আমি বুঝতে পারলাম না, তাই সব সময় যেটা করি সেটাই করলাম। একটা কথাও না বলে চুপ করে বসে রইলাম। আম্মু বললেন, "টেলিভিশনে বলেছিস তোর ফেমিলির সবাই তোকে পড়াশোনায় উৎসাহ দেয়?"

"আমি সেটা বলেছি! টেলিভিশনের লোকেরা আমার কাছে সেটাই শুনতে চেয়েছিল তাই বলেছি। আম্মু দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "তুই আমাদেরকে নিয়ে টেলিভিশনে টিটকারি মারিস? তোর এতো বড় সাহস? আমি তোকে খুন করে ফেলব আজকে?"

আম্মু হাতের রডটা উপরে তুললেন, আমি কখনো আম্মুর সাথে কথা বলি না, নিঃশব্দে মার খেয়ে যাই। আজকে কী হলো জানি না আমি হঠাৎ কথা বলতে শুরু করলাম, বললাম, "আম্মু!"

"কী বলতে চাস?"

"আসলেই আমি তোমার কাছ থেকে উৎসাহ পাই আম্মু।"

"আমার কাছ থেকে উৎসাহ পাস? আমি কী করেছি তোর জন্যে যে তুই উৎসাহ পাস?" আম্মু রডটা ঝাঁকালেন, আমি জানি, এক্ষুণি আমার মাথায় নেমে আসবে সেটা।

আমি কাতর গলায় বললাম, "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তুমি আমাকে কতো আদর করতে মনে আছে? আমার যখন মন খারাপ হয় তখন আমি সেই সময়ের কথা ভাবি আর আমার মন ভাল হয়ে যায়! আমি এখনোও সেই সময়ের কথা চিন্তা করে উৎসাহ পাই আম্মু।"

আম্মু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি ফিসফিস করে বললাম, "এখন তুমি আমাকে যাই কর না কেন- ছোট থাকতে আমাকে যে আদর করেছিলে সেটা কেউ আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না। বিশ্বাস করো তুমি।"

আম্মু কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিঃশব্দে লোহার রডটা নামিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

আমি চুপচাপ আমার বিছানায় বসে রইলাম। এর আগে সবসময় আমার নিজের জন্যে মায়া হয়েছে— আজকে কী হলো কে জানে হঠাৎ করে আমার আম্মুর জন্যে মায়া হতে শুরু করল।

বন্ধু এবং বন্ধু

আমি যখন পরদিন স্কুলে গেলাম তখন ক্লাসের সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল- আমাকে কেউ বলে দেয় নি কিন্তু আমি দেখেই বুঝতে পারলাম আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, কোন সন্দেহ নেই যে সবচেয়ে জোরে চিৎকার করছে প্রিয়াংকা, কিন্তু তার গলায় এখনো কোন শব্দ নেই। মোটাসোটা কয়েকজন আমাকে কীভাবে কীভাবে জানি ঘাড়ে তুলে ফেলল। অন্যেরা আমাকে ঘিরে লাফাতে লাগলো। মৌটুসি কোথা থেকে জানি কয়েকটা ফুল নিয়ে এসেছে, সেগুলো ছিঁড়ে পাপড়িগুলো সবাই মিলে আমার ওপর ছিটাতে শুরু করলো। আমি মেডেলটা পকেটে করে নিয়ে এসেছিলাম, সেটা টের পেয়ে জয়ন্ত পকেট থেকে বের করে নিয়ে এসেছে, সবাই সেটা গলায় দিয়ে লাফালাফি করতে লাগলো! সেখানেই শান্ত হলো না, আমাকে ঘাড়ে নিয়ে তারা স্কুলের মাঠে চলে গেলো, সেখানে কয়েকজন আমাকে ঘাড়ে নিয়ে স্কুলের মাঠে চক্কর দিতে লাগলো- অন্যেরা চিৎকার করতে করতে পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলো। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ হলো সবচেয়ে বেশি তারা পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, "অঙ্ক ভাই, অঙ্ক ভাই, অঙ্ক ভাই অঙ্ক ভাই..." চেঁচামেচি হৈচৈ শুনে স্যার আর ম্যাডামরা বের হয়ে এলেন, বের হয়ে এই দৃশ্য দেখে সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

স্কুলের এসেম্বলিতে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম গণিত প্রতিযোগিতা নিয়ে দুই একটি কথা বললেন। তখন ক্লাস থ্রির যে মেয়েটা পুরস্কার পেয়েছে তাকে আর আমাকে সামনে ডেকে আনা হলো। স্কুলের দপ্তরি কয়েকটা খবরের কাগজ নিয়ে দাড়িয়ে ছিল, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সেখান থেকে কিছু কিছু জায়গা পড়ে শোনালেন। আমার জন্যে সারা দেশে আমাদের স্কুলের সুনাম কেমন বেড়ে গেছে সেটা বলার পর সবাই হাততালি দিতে লাগলো। আমি আড়চোখে রাজাকার স্যারকে দেখার চেষ্টা করলাম, মাত্র কয়দিন আগেই রাজাকার স্যার

টি.সি. দিয়ে আমাকে বিদায় করে দেবার কথা বলেছিলেন, তা না হলে নাকী পুরো স্কুলের বেইজ্জতি হবে! এখন রাজাকার স্যার কী বলবেন?

গণিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন হবার পর একেবারে ম্যাজিকের মতো স্কুলে আমার অবস্থাটা পাল্টে গেলো। আগে আমাকে দেখলে ছেলে-মেয়েরা দূরে সরে যেতো, এখন আমাকে দেখলেই সবাই দাঁত বের করে হেসে বলে, "কী খবর আইনস্টাইন? আজকে কোন কিছু আবিষ্কার হলো?" আমি তাদের অনেকবার বলেছি আইনস্টাইন হচ্ছেন একজন বৈজ্ঞানিক– গণিতবিদ না, কিন্তু কোন লাভ হয় নাই। আগে মেয়েরা আমাকে রীতিমতো ভয় পেতো, চোখ পাকিয়ে কারো দিকে তাকালেই মনে হতো এখনই ভ্যাঁ করে কেঁদে দিবে। এখন আমাকে ভয় তো পায়ই না উল্টো আমার সাথে গল্প করার জন্যে চলে আসে! এলজেবরা জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতির কোন কিছু না বুঝলেই এখন তারা আমার কাছে চলে আসে, আমাকে সেগুলো বুঝিয়ে দিতে হয়। মেয়েগুলি দুষ্টুও কম না, বেশি সময় থাকার জন্যে অনেক সময় বুঝেও না বোঝার ভান করে! তবে সবচেয়ে মজা হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে– তাদের ধারণা আমি ভাল অঙ্ক জানি, তার মানে আমি নিশ্চয়ই বড় বড় গুণ করতে পারি। দেখা হলেই বলে, "অঙ্ক ভাই, অঙ্ক ভাই, সাতশ' তেইশ আর নয় হাজার চব্বিশ গুন করলে কতো হয়?"

আমার মাথায় যেটা আসে সেটাই বলে দিই, "পঁয়ষট্টি লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশ' বাহান্ন।" উত্তরটা ভুল হলো না শুদ্ধ হলো সেইটা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, কিছু একটা উত্তর পেলেই তারা খুশি!

স্কুলের স্যারেরাও আমাকে আজকাল একটু ভাল চোখে দেখেন। সবচেয়ে মজা হয়েছিল সেদিন জ্যামিতি ক্লাসে, স্যার ক্লাসে এসে বললেন, "আমার খুব একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে রে! তপু তুই ক্লাসটা নিতে পারবি না?"

আমি বললাম, "পারব স্যার। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনবে না, খালি আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।"

স্যার বললেন, "করে দেখুক। আমি টেনে কল্লা ছিঁড়ে ফেলব না!"

স্যার টেনে কল্লা ছিঁড়ে ফেলবেন শোনার পরেও সবাই হাসাহাসি করলো কিন্তু তার মাঝেই আমি জ্যামিতি ক্লাসটা নিয়ে নিলাম। কঠিন কঠিন কয়েকটা উপপাদ্য বুঝিয়ে দিলাম। আমার মনে হয় সবাই বেশ ভালই বুঝেছে। দিলীপকেও দেখলাম কয়েবার মাথা নাড়ল।

আমার এরকম নতুন জীবন শুরু হওয়ায় সবচেয়ে খুশি হয়েছে প্রিয়াংকা! তার ভাঙ্গা গলা ঠিক হতে পাকা এক সপ্তাহ লেগে গেলো, কাজেই সে যে কীভাবে আমাকে আবিষ্কার করে গণিত প্রতিযোগিতায় নিয়ে গেছে এবং আমাকে চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ফেলেছে এবং এই ব্যাপারটাতে পুরো কৃতিত্বটাই যে তার এবং আমার কোনই কৃতিত্ব নই সে বিষয়টা সবার শুনতে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতে লাগলো আমি যেন কোরবানির গরু এবং আমার নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং সবাইকে বলছে যে এরকম মোটাতাজা কোরবানির গরুটা কিনে আনার পুরো কৃতিত্বটাই তার! তবে প্রিয়াংকাকে সবাই পছন্দ করে, কাজেই সবাই তার সব কথা মেনে নেয়। আর এটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে প্রিয়াংকার আগে কেউ কোন দিন আমার সাথে ভাল করে কথাও বলে নি! সত্যিই সে আমাকে আবিষ্কার করেছে।

ক্লাসের কেউ আমার সাথে আম্মু নিয়ে কথা বলে না কিন্তু আমার ধারণা কীভাবে কীভাবে সবাই আসল ব্যাপারটা জেনে গেছে। কিন্তু আমার ধারণা এখানেও প্রিয়াংকার একটা হাত আছে, সে সবাইকে বলে রেখেছে কেউ যদি ভুলেও আমার সাথে আম্মু নিয়ে কথা বলে তাহলে সে পিটিয়ে তাদের হাঁটুর মালাই চাকি খুলে রাখবে।

শুধু বাসাতে আমার জীবন মোটামুটি আগের মতোই থেকে গেল। একেবারে কিছু পরিবর্তন হয় নাই তা নয়, আমাকে আর বাথরুম ধুতে হয় না, দুলি খালাকে রান্নাবান্নায় সাহায্যও করতে হয় না। আগে স্কুলে বেতনের জন্যে অনেক আগে থেকে আপুর পিছনে পিছনে ঘুরতে হতো, এখন আপু নিজেই একটা খামে করে বেতনের টাকাটা দিয়ে যায়। অথচ মজার ব্যাপার হলো আমাকে স্কুলে আর বেতন দিতে হয় না। শুধু যে বেতন দিতে হয় না তা নয় উল্টো আমাকে মাসে মাসে তিনশ' টাকা বৃত্তি দেয়া হয়। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন আমি টিউশানি করাতে রাজি আছি কী না। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে একটা ভাল ছাত্র ম্যাথমেটিক্সের একটা টিউটর খুঁজছে। যদি এই টিউশানিটা পেয়ে যাই তাহলে প্রতি মাসে কমপক্ষে নিশ্চয়ই দুই হাজার টাকা করে পাব। ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ে তাদের কাছে টাকা নাকী হাতের ময়লা!

প্রিয়াংকা আগের মতোই আছে। এখনো সে গোপনে 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ বিতরণ' করে যাচ্ছে! এগুলো গোপনীয় হলেও সে মাঝে মাঝে আমাকে বলে। আমি তার সাথে যেতে চাইলে আমাকে নিয়েও যায়। একদিন একটা থুত্থুড়ে

বুড়োকে একটা দাবার বোর্ড আর ঘুঁটির প্যাকেট দিয়ে ফিরে আসছে, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, "তুই যে এভাবে একলা একলা জায়গায়-অজায়গায় ঘুরে বেড়াস তোর বাসা থেকে কিছু বলে না?"

প্রিয়াংকা রেগে বলল, "আমি মোটেও জায়গায়-অজায়গায় ঘুরে বেড়াই না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে– ঠিক আছে!" আমি নিজেকে শুদ্ধ করে বললাম, "তুই যে একলা একলা নানারকম ইন্টারেস্টিং জায়গায় ঘুরে বেড়াস– তোকে বাসা থেকে কিছু বলে না?"

"উঁহুঁ।"

"তোর আব্বু-আম্মু দুজনেই তোকে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেয়?"

"আমার আম্মু নেই।"

"ও।" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। ইতস্তত করে বললাম, "তোর আব্বু?"

"আব্বু আছেন।"

"ও।"

আমরা দুজন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলাম। একসময় প্রিয়াংকা বলল, "আমার বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। যাবি?"

আমি তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। জিজ্ঞেস করলাম, "তোর আব্বু কী বাসায় আছেন?"

"আছেন। সব সময়ে থাকেন।"

"আ-আমাকে দেখে রাগ হবেন না তো?"

প্রিয়াংকা হি হি করে হাসলো, বলল, "ধুর গাধা, রাগ হবেন কেন?"

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, "না মানে ইয়ে—"

আমরা আরো কিছুক্ষণ হাঁটলাম, সরু একটা রাস্তার পাশে পুরানো একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়াংকা বলল, "এই যে আমাদের বাসায় এসে গেছি।"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা দরজায় শব্দ করল। কয়েক মিনিট পরে ঘুট করে শব্দ করে দরজা খুলে গেলো। আমি দেখলাম হুইল চেয়ারে বসে থাকা একজন মানুষ। মানুষটার চেহারা খুব সুন্দর, এক মাথা কালো চুল, কানের কাছে সেই চুলে পাক ধরেছে। চোখে পাতলা ধাতব রিমের একটা চশমা। প্রিয়াংকা একটু আগে বলেছিল তার আব্বু সবসময় বাসায় থাকেন, এখন তাকে দেখে বুঝতে পারলাম কেন। হুইল চেয়ারে করে কোথায় আর যাবেন?

প্রিয়াংকা বলল, "আব্বু, দেখো একজন গেস্ট এসেছে।"

প্রিয়াংকার আব্বু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের বিখ্যাত গণিতবিদ?"

"হ্যাঁ, আব্বু।"

"ভেরি গুড। এসো তপু এসো। প্রিয়াংকার কাছে তোমার অনেক গল্প শুনেছি। পত্রিকায় তোমার ছবি দেখে ভেবেছিলাম তুমি আরো বড়! তুমি তো আসলে অনেক ছোট।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। প্রিয়াংকা নিজের জুতো খুলে খালি পায়ে ভেতর থেকে একটু ঘুরে এসে বলল, "তপু, আমার আব্বু হচ্ছেন একজন লেখক।"

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যিকার লেখক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী নাম।"

প্রিয়াংকা হি হি করে হাসল, বলল, "নাম বললে তুই চিনবি না। আসলে কেউই চিনবে না। আব্বু দুই তিন বছর পরিশ্রম করে যে বই লিখে সেটা ছাপা হয় দশ কপি। যে ছাপায় সে কিনে পাঁচ কপি আর আব্বু কিনে পাঁচ কপি!"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "সেই পাঁচ কপি কিনে তোর আব্বু কী করে সেটাও বলে দে।"

"বাসায় যদি কেউ আসে জোর করে তাকে একটা কপি ধরিয়ে দেয়। আজকে তুই এসেছিস তোকেও আব্বুর বইয়ের এক কপি নিয়ে যেতে হবে দেখিস!"

আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে প্রিয়াংকা আর তার আব্বুর দিকে তাকিয়ে রইলাম, দেখে মনে হচ্ছে দুইজন সমবয়সী বন্ধু কথা বলছে! আমার আব্বু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমিও কী এভাবে কথা বলতে পারতাম?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কীসের ওপর বই লিখেন?"

প্রিয়াংকার আব্বু কথা বলার আগেই প্রিয়াংকা বলল, "তুই শুনলে বিশ্বাস করবি না। আব্বু যে সব বিষয়ের ওপর বই লিখে সেসব বিষয় যে আছে সেটাও তুই জানিস কী না সন্দেহ আছে!"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "ব্যাস অনেক বাপের বদনাম করা হয়েছে। এখন তোর বিখ্যাত বন্ধুর জন্য চা-নাস্তা কিছু নিয়ে আয়।"

প্রিয়াংকা বলল, "আনছি বাবা আনছি।"

প্রিয়াংকা রান্নাঘরের দিকে চলে যাবার পর প্রিয়াংকার আব্বু আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "আমার বইগুলো হচ্ছে অবলুপ্ত প্রাণীদের ওপর।"

"অবলুপ্ত প্রাণী?"

"হ্যাঁ। আমাদের এই অঞ্চলে এক সময় গণ্ডার থাকতো তুমি জানো?"

আমি জানতাম না, তাই অবাক হয়ে তাকালাম। প্রিয়াংকার আব্বু বললেন "শুধু গণ্ডার না, এখানে বনরুই বলে একটা প্রাণী থাকতো, নীল গাই নাম এক ধরনের প্রাণী থাকতো এখন সব অবলুপ্ত হয়ে গেছে, না হয় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম প্রাণীগুলো যখন থাকবেই না অন্তত তার ইতিহাসটা বেঁচে থাকুক। কী বলো?"

আমি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লাম। আমি এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি প্রিয়াংকা কেমন করে প্রিয়াংকা হয়েছে! তার আব্বু আমার সাথে এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আমি একজন বড় মানুষ। প্রিয়াংকার সাথেও নিশ্চয়ই এভাবে কথা বলেন, তাই প্রিয়াংকা নিজে বোঝার আগেই বড় হয়ে গেছে। তার কথাবার্তা, চালচলন সব বড় মানুষের মতো। আমি আড়া চোখে কয়েকবার প্রিয়াংকার আব্বুর দিকে তাকালাম, হুইল চেয়ারে তার পাগুলো দেখে মনে হয় না সেখানে কোন সমস্যা আছে- কিন্তু আসলে নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে হুইল চেয়ারে কেন? কী হয়েছিল কে জানে!

কিছুক্ষণের মাঝেই প্রিয়াংকা চানাচুর আর চা নিয়ে এলো। এইটুকুন সময়ের মাঝে চানাচুরগুলো কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। ছোট একটা টেবিল ঘিরে আমরা বসেছি- আমি আর প্রিয়াংকা চেয়ারে, প্রিয়াংকার আব্বু হুইল চেয়ারে। চা খেতে খেতে প্রিয়াংকা কথা বলতে লাগলো- প্রিয়াংকার আব্বু এক সময় তাকে থামালেন, বললেন, "প্রিয়াংকা তোর কথা তো প্রত্যেক দিনই শুনি- আজকে তোর গেস্টের মুখ থেকে কিছু শুনি।"

প্রিয়াংকা হি হি করে হেসে বলল, "তাহলেই হয়েছে। আমাদের তপু মাত্র তিনটা শব্দ জানে। একটা হচ্ছে 'ও', আরেকটা 'আচ্ছা' আর আরেকটা 'তাই নাকী!' তাই তুমি যদি তপুর কথা শুনতে চাও এই তিনটাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

প্রিয়াংকার আব্বু হেসে বললেন, "ঠিক আছে, এই তিনটাতেই না হয় সন্তুষ্ট থাকব, কিন্তু তার মুখ থেকে শুনে সন্তুষ্ট থাকি!'

প্রিয়াংকার আব্বু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খবরের কাগজে তোমার সম্পর্কে যেটা লিখেছে সেটা পড়ে মনে হলো তুমি হয়তো একটা ইয়াং প্রডিজি।

প্রডিজি কী জানো তো- খুব কম বয়সে যাদের মেধার অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে তাদেরকে বলে প্রডিজি।"

আমি অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলাম, "না— সেরকম কিছু না!"

"তোমার বিনয় করার প্রয়োজন নেই। দেখা গেছে গণিত সঙ্গীত এসব বিষয়ে মেধা সাধারণত খুব কম বয়সে বিকশিত হয়।"

আমি বললাম, "ও।"

"আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে তো?"

"কন্ট্রোল?"

"হ্যাঁ।" প্রিয়াংকার আব্বু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "আমার মেয়ে তোমাকে রাতারাতি বিখ্যাত বানিয়ে ফেলে মহাখুশি। আমার প্রশ্ন হলো সেটা তোমার জন্যে কী ভাল হলো, নাকী খারাপ হলো?"

প্রিয়াংকা ঠকাস কার কাপটা টেবিলে রেখে বলল, "কী বলছ তুমি আব্বু? এটা আবার খারাপ হবে কেমন করে?"

"আমি সেটাই বলার চেষ্টা করছি। খ্যাতি খুব বিচিত্র একটা জিনিস। এটা লটারির মতো- অনেক চেষ্টা করেও এটা পাওয়া যায় না। যারা পাবার তারা এমনিতেই পায়। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানিস?"

"কী?"

"বেশিরভাগ সময়ে খ্যাতিটা অপাত্রে যায়। যারা পায় তারা সেটা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না।"

প্রিয়াংকা বলল, "বুঝলি তপু, এই জন্যে আমাদের বাসায় কেউ আসতে চায় না। আসলেই আব্বু এমন জ্ঞানের কথা শুরু করে দেয় যে সে কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালায়।"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "বাজে কথা বলবি না। আজকে প্রথম তুই একজন বিখ্যাত মানুষ এনেছিস। এর আগে বিখ্যাত কেউ এসেছে?"

আমি অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে বললাম, "আমি মোটেও বিখ্যাত না-"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "কিন্তু তোমার ভেতরে বিখ্যাত হবার সবগুলো এলিমেন্ট আছে। সে জন্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যদি কখনো খ্যাতি এসে তোমার হাতে ধরা দেয়, তুমি সেটা কন্ট্রোল করতে পারবে?"

আমি এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব সেটা বুঝতে পারলাম না। মথা চুলকে বললাম "এ্যাঁ, এ্যাঁ-এ্যাঁ-"

প্রিয়াংকা হি হি করে হেসে বলল, "তপুর তিন শব্দের সাথে চার নম্বর শব্দ যোগ হলো সেটা হচ্ছে এ্যাঁ!"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "আসলে এইটুকুন ছেলেকে অনেক বড় প্রশ্ন করে ফেলেছি তো– উত্তর দেবে কী ভাবে?"

আমি বললাম, "আপনি উত্তরটা দিয়ে দেন!"

"আমি দিলে সেটা তো আমার উত্তর হবে তোমার উত্তর হবে না!"

আমি আবার মাথা চুলকে বললাম, "এ্যাঁ, এ্যাঁ এ্যাঁ..."

সেটা শুনে প্রিয়াংকা আবার হি হি করে হেসে ফেলল। প্রিয়াংকার আব্বুও একটু হাসলেন, হেসে বললেন, "আমার কয়েক জন খুব বিখ্যাত বন্ধু আছে, নাম বললে তোমরা চিনবে! আমি তাদেরকে খুব ভাল করে স্টাডি করেছি। করে কী দেখেছি জানো?"

"কী?"

"খ্যাতিটা গুরুত্বপূর্ণ না। যে গুণের জন্যে খ্যাতি এসেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই মিছিমিছি খ্যাতির পিছনে ছুটতে হয় না। মানুষ তো একটামাত্র জীবন পায়, সেই জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে হয়। তাই বলছিলাম একজন বিখ্যাত মানুষ হয়ে বিশেষ লাভ নেই কিন্তু একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে অনেক লাভ–"

প্রিয়াংকা বলল, "এই জন্যে আমি বাসায় কাউকে আনতে চাই না। সুযোগ পেলেই তুমি উল্টাপাল্টা কথা বলে মাথা আউলাঝাউলা করে দাও।"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "ঠিক আছে, আর আউলাঝাউলা করব না। তার চাইতে আমার লাস্ট বইটা নিয়ে আয়, তপুকে দেখাই।"

"কোন জ্ঞানের কথা বলতে পারবে না কিন্তু।"

"ভয় পাস না, বলব না।"

প্রিয়াংকা তখন শেলফ থেকে তার আব্বুর লেখা বেশ কয়েকটা বই নামিয়ে আনল।

আমি যখন বিকালবেলা প্রিয়াংকার বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম তখন সে আমাকে একটু এগিয়ে দিতে এলো। আমি যখন বললাম কোন দরকার নেই তখন সে বলল মোড়ের দোকান থেকে তার নাকী ডিম আর তেল কিনতে হবে।

রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম, "আচ্ছা প্রিয়াংকা, তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?"

"আব্বু কেন হুইল চেয়ারে সেটা জিজ্ঞেস করবি তো?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমি যখন ছোট তখন একটা গাড়ি একসিডেন্ট হয়েছিল। আম্মু স্পট ডেড। আব্বুর কোমর থেকে নিচে প্যারালাইজড।"

আমি কিছুক্ষণ প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "তোর সাথে আমার একটা মিল আছে দেখেছিস?"

"কী মিল?"

"আমার বেলায় একসিডেন্টে আব্বু স্পট ডেড, আম্মু প্যারালাইজড! তোর আব্বুর শরীর আর আমার আম্মুর মন!"

প্রিয়াংকা কোন কথা না বলে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। আমি অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করতে লাগলাম, কোনটা ভাল? শরীর অবশ হয়ে যাওয়া নাকী মন অবশ হয়ে যাওয়া?

সারপ্রাইজ পার্টি

প্রিয়াংকা এটা ঠিক কীভাবে করে জানি না– আমাদের ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের যেদিন যার জন্মদিন সেদিন সে তার জন্যে একটা উপহার নিয়ে আসে। খুব যে একটা দামি উপহার আনে তা না– ছোটখাটো উপহার কিন্তু সে খুব ভাবনাচিন্তা করে সেটা আনে। জাবেদ হচ্ছে বইয়ের পোকা, তার জন্যে আনলো একটা বই এবং মজার কথা হচ্ছে এমন একটা বই যে বইটা জাবেদ পড়ার জন্যে অনেক দিন থেকে খুঁজছে এবং খুঁজে পাচ্ছে না। বইয়ের প্যাকেটটা খুলে সে যখন বইটা দেখলো তার মুখটা একেবারে একশ' ওয়াট বালবের মতো জ্বলে উঠল। আমি তখন বুঝতে পারলাম প্রিয়াংকা কেন এটা করে– একজন মানুষের মুখ যখন আনন্দে একশ' ওয়াট বালবের মতো জ্বলে ওঠে সেটা দেখার চাইতে মজার ব্যাপার আর কী আছে? আমাদের নীলিমা হচ্ছে একজন গায়িকা তার জন্যে প্রিয়াংকা আনলো একটা স্বরলিপির বই, বইটা পুরানো এবং পোকা খাওয়া। আমি ভেবেছিলাম এই বইটা দেখে নীলিমা নিশ্চয়ই একটু বিরক্ত হবে– হলো ঠিক তার উল্টো, খুশিতে লাফাতে লাগলো কারণ সেটাতে নাকী দ্বিজেন্দ্রলালের কোন একটা হারিয়ে যাওয়া গানের স্বরলিপি আছে! আমাদের ইশতিয়াক হচ্ছে ক্রিকেটের ভক্ত, দুনিয়ার সব ক্রিকেটারদের নামধাম তার মুখস্থ। তাকে দিলো একটা সাইবার ক্যাফের কুপন পিছনে একটা ওয়েব সাইটের ঠিকানা। ঠিকানার নিচে প্রিয়াংকা লিখে দিয়েছে এখানে পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেটের খবর আছে! ইশতিয়াক ইন্টারনেট সাইবার ক্যাফে এসব কিছুই জানতো না, আরেকজনকে নিয়ে সেটা দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেলো! সারা জীবনের জন্যে সে প্রিয়াংকার ভক্ত হয়ে গেলো সাথে সাথে।

প্রিয়াংকার এই 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ প্রদান পদ্ধতি'টা আমরা সবাই কম-বেশি টের পেতে শুরু করেছি। বিষয়টা মনে হয় একটু ছোঁয়াচে, ক্লাসের আরও অনেকে দেখি সেটা করতে শুরু করেছে। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ইংলিশ মিডিয়াম সেই ছাত্রটার জন্যে আমাকে প্রাইভেট টিউটর বানিয়ে দেয়ার পর মাসের শেষে আমি যখন আড়াই হাজার টাকা পেলাম আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার

অবস্থা হলো। আমিও তখন একটু 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ প্রদান' পদ্ধতি করার চেষ্টা করলাম– প্রিয়াংকা যেরকম অনেক দিন সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আমি সেরকম পারি না তাই আমি এরকম জটিল কিছু করার চেষ্টা করলাম না, ক্লাসের সবার জন্যে মোড়ের দোকান থেকে জিলিপি কিনে নিয়ে এলাম। সবাই যখন কাড়াকাড়ি করে জিলিপি খেলো এবং জিলিপির রসে কারো হাত কারো বই খাতা এবং কারো জামা-কাপড় আঠা আঠা হয়ে গেলো সেটাও কম মজার ব্যাপার হলো না।

তবে আমরা কেউ প্রিয়াংকাকে হারাতে পারলাম না, আমরা যখন 'বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ প্রদান'-এর চেষ্টা করি সেটা অনেক সময় হয়ে যায় জোর করে করা, সাজানো বা কৃত্রিম। প্রিয়াংকা যখন করে সেটা হয় একেবারে স্বাভাবিক। দেখতে দেখতে প্রিয়াংকা মেয়েটার জন্যে ক্লাসের সবার এতো মায়া হয়ে গেলো সেটা আর বলার নয়। সেটা আমি বুঝতে পারলাম একদিন দুপুরবেলা যখন ক্লাসের সবচেয়ে কাঠখোট্টা ছেলে মুশফিক ঘ্যাস ঘ্যাস করে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমাদের প্রিয়াংকার জন্যে কিছু একটা করা দরকার!"

আশেপাশে যারা ছিলো তারা সবাই ঘুরে মুশফিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো, সবাই কখনো না কখনো এই কথাটা ভেবেছে। ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক এবং মুখচোরা শিউলি বলল, "হ্যাঁ, আমাদের সবাই মিলে প্রিয়াংকার জন্যে কিছু একটা করা উচিত।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, "সবাই মিলে।" সবাই শব্দটাতে সে আলাদা ভাবে জোর দিলো।

আমি একটু অবাক হয়ে দেখলাম আশেপাশে যারা ছিল তারা সবাই কাছাকাছি জড়ো হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। প্রিয়াংকা এর মাঝে কার জন্যে কী করেছে সেটা নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেলো– আমার হয়তো সবচেয়ে বেশি কথা বলা উচিত ছিলো কিন্তু আমি চুপ করে বসে অন্যদের কথা শুনতে লাগলাম। প্রিয়াংকার জন্যে কী করা যায় সে ব্যাপারে ছেলেরা এবং মেয়েরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। মোটাসোটা আদনান বলল প্রিয়াংকাকে নিয়ে আমাদের কোথাও চাইনিজ না হলে পিতজা খেতে যাওয়া উচিত। সব ছেলেরা জোরে জোরে মাথা নেড়ে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিল। মৌটুসি বলল প্রিয়াংকার জন্যে আমাদের একটা গানের অনুষ্ঠান করা উচিত এবং সব মেয়েরা সেই প্রস্তাবে ছেলেদের থেকেও জোরে জোরে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। ছেলেদের এবং মেয়েদের মাঝে একটা ঝগড়া শুরু হয়ে যাবার

অবস্থা ঠিক তখন প্রিয়াংকা ক্লাসে হাজির হলো বলে ঝগড়াটা বেশি দূর গড়াতে পারল না।

পরের দিন যখন প্রিয়াংকা আশে-পাশে নেই তখন আবার আগের আলোচনা শুরু হলো– জয়ন্ত চাইনিজ কিংবা গানের অনুষ্ঠান এই দুটো কোনটাতেই না গিয়ে বলল, "আমাদের করা উচিত একটা সারপ্রাইজ পার্টি।"

আদনান ভুরু কুঁচকে বলল, "সারপ্রাইজ পার্টি?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। সেখানে তোর খাওয়া-দাওয়াও থাকতে পারে আবার ধর গান-বাজনাও থাকতে পারে।"

প্রস্তাবটা অনেকের মনে ধরল। মৌটুসি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় হবে সারপ্রাইজ পার্টি?"

মামুন বলল, "এই ক্লাসেই করতে হবে।"

আদনান বলল, "ক্লাসে? ক্লাসে খাওয়া-দাওয়াটা হবে কেমন করে?"

মৌটুসি বলল, "গান-বাজনা করতে হলে হারমোনিয়াম তবলা লাগবে না? ক্লাসে সেটা আনবি কেমন করে?"

আদনান বলল, "আর যদি আনাও হয় সেটা তাহলে সারপ্রাইজ থাকবে না। প্রিয়াংকা বুঝে যাবে।"

শিউলি বলল, "হ্যাঁ। মনে নাই সে একবার আমার জন্মদিনে আমাকে সারপ্রাইজ দিল?"

সেটি সত্যি, সারপ্রাইজ পার্টি দেওয়ার নিয়মকানুন প্রিয়াংকাই সবচেয়ে ভাল জানে! তাকে 'সারপ্রাইজ' করা মনে হয় খুব সোজা না। ক্লাসে তাকে সারপ্রাইজ করতে হলে মনে হয় সে তো 'সারপ্রাইজ' হবেই না, উল্টো আমরা 'সারপ্রাইজ' হয়ে যাব।

আমাদের মাঝে দিলীপ কথাবার্তা কম বলে, সেটা তার বেশি বুদ্ধির লক্ষণ না কম বুদ্ধির লক্ষণ সেটা আমরা এখনো জানি না। পড়াশোনার ব্যাপারে সে যে খুব ঢিলে সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু অন্য বিষয়ে সে কী রকম তার পরীক্ষা কখনো হয় নি। সে হাই তুলে বলল, "আসলে এইটা করতে হবে প্রিয়াংকার বাসায়।"

আমরা সবাই অবাক হয়ে বললাম, "প্রিয়াংকার বাসায়?"

দিলীপ মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

মৌটুসি জানতে চাইল, "সেটা কীভাবে করবি?"

"তা আমি জানি না।" বলে দিলীপ হেঁটে হেঁটে চলে গেলো।

প্রথমে কেউ দিলীপের কথাটা গুরুত্ব দিয়ে নেয় নাই কিন্তু সবাই যখন ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা চিন্তা করলো তখন বুঝতে পারল, সেটাই সবচেয়ে সঠিক

জায়গা। সকালবেলা প্রিয়াংকা যখন বের হয়ে যাবে তখন আমরা সবাই সবকিছু নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে যাব। সবকিছু চটপট রেডি করে ফেলব তারপর প্রিয়াংকা যখন ফিরে আসবে তখন চিৎকার করে বলব, 'সারপ্রাইজ' সাথে সাথে পার্টি শুরু হয়ে যাবে এবং সেটা হবে একেবারে ফাটাফাটি পার্টি! কিন্তু সমস্যা একটাই, আমরা সবাই মিলে প্রিয়াংকার বাসায় ঢুকবো কেমন করে? সেটা নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন মৌটুসি আমার দিকে তাকালো এবং তাকিয়েই রইলো। আমি বললাম, "আমার দিকে তুই এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?"

মৌটুসি বলল, "তুই।"

"আমি? আমি কী?"

"তুই ব্যবস্থা করবি।"

"আমি কীসের ব্যবস্থা করব?"

"কেমন করে প্রিয়াংকার বাসায় যাওয়া যায়।"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি কেন?"

"তা না হলে কে? প্রিয়াংকা তোর জন্যে কী করেছে তুই জানিস?"

সত্যি কথা বলতে কী প্রিয়াংকা আমার জন্যে কী করেছে সেটা অন্যেরা কিছুই জানে না। অন্যেরা শুধু জানে গণিত কম্পিটিশনে আমাকে নিয়ে যাবার অংশটুকু! বাকিটুকু শুধু জানি আমি। আমি বললাম, "হ্যাঁ, জানি?"

"তাহলে?" এবারে মৌটুসির সাথে অন্যেরাও যোগ দিলো। জয়ন্ত বলল, "তোর মাঝে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নাই?" মামুন বলল, "তুই প্রিয়াংকার জন্যে কিছু করতে চাস না?" আদনান বলল, "প্রিয়াংকা তোর জন্যে যেটা করেছে সেটা কী অন্য কেউ করতো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, কিন্তু–"

"কোন কিন্তু নাই।" শিউলির মতো মুখচোরা লাজুক মেয়েটা পর্যন্ত হাত তুলে আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "তোমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "কিন্তু-মানে-আমি-ইয়ে-বলছিলাম কী–তাহলে–"

কাজেই কেউ আমার কথা শুনলো না।

আমি কী করব বুঝতে না পেরে পরের দিনই স্কুল ছুটির পর প্রিয়াংকাদের বাসায় হাজির হলাম। প্রিয়াংকা সরাসরি বাসায় যায় না, দুনিয়া ঘুরে নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে আনন্দ বিতরণ করে তারপর বাসায় ফিরে আসে। আমি দরজায়

শব্দ করলাম, কিছুক্ষণ পর খুট করে শব্দ করে প্রিয়াংকার আব্বু দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে একটু অবাক হলেন কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না, বললেন, "আরে আমাদের ম্যাথমেটিশিয়ান দেখি! এসো এসো।"

আমি ভিতরে ঢুকলাম। প্রিয়াংকার আব্বু তার হুইল চেয়ারটি ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরে যেতে যেতে বললেন, "বসো তপু। প্রিয়াংকা তো এখনো বাসায় আসে নাই, তার আসতে দেরি হয়-"

"জানি।" আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি আসলে আপনার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে?"

"জি।"

"কী ব্যাপার?"

"ইয়ে মানে আমি- বলছিলাম কী- এঁ্যা এঁ্যা-" প্রিয়াংকার আব্বু খুব ধৈর্য ধরে মুখে হাসি ফুটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, "আমাদের ক্লাসের সবাই ঠিক করেছে যে প্রিয়াংকার জন্যে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দেবে।"

"তাই নাকী! কী উপলক্ষে?"

"কোন উপলক্ষ না। এমনিই।"

"এমনিতেই সারপ্রাইজ পার্টি?"

"জি।"

প্রিয়াংকার আব্বু হেসে বললেন, "তা আমাকে কী করতে হবে?"

"সবাই মিলে ঠিক করেছে পার্টিটা এইখানে হবে।"

"এইখানে?" এবারে প্রিয়াংকার আব্বুর মুখে খুব হালকা মতোন একটু দুশ্চিন্তা উঁকি দিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তিনি দুশ্চিন্তাটা লুকিয়ে ফেললেন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আপনার কিছুই করতে হবে না। সব আমরা করব। আমরা খাবারদাবার নিয়ে আসব। একটা গানের অনুষ্ঠান হবে-"

"গানের অনুষ্ঠান?" মনে হলো আবার তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো। এবারে ঠিক হালকা দুশ্চিন্তার ছাপ নয় বেশ গভীর।

আমি বললাম, "জি। আমাদের ক্লাসের কয়েকজন খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। কয়েকজন একটা নাটকও করতে চাইছে।"

"না-নাটক?" এবারে প্রিয়াংকার আব্বুর মুখে আরও বেশি দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো, সেটা ঠিক লুকানোর চেষ্টাও করলেন না। আমতা আমতা করে বললেন, "ইয়ে আমি বলছিলাম কী, সারপ্রাইজ পার্টি সাধারণত সারপ্রাইজ

থাকে না। তার চেয়ে একটা সাধারণ পার্টি করলে ভাল হয় না? খুব সিম্পল। তোমরা সবাই আসলে- আমি আর প্রিয়াংকা মিলে তোমাদের জন্যে একটু চা-নাস্তা রেডি করলাম-"

"উঁহুঁ।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "ক্লাসের ছেলেমেয়েরা রাজি হবে না।"

প্রিয়াংকার আব্বু চিন্তিত মুখে বললেন, "রাজি হবে না?"

"নাহ!" আমি মুখটা গম্ভীর করে বললাম, "সবাই প্রিয়াংকাকে খুব পছন্দ করে তো- তাই- তার জন্যে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দিতে চায়।"

প্রিয়াংকার আব্বু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে! তাহলে তো করতেই হয়।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "জি।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"কিছু করতে হবে না।" আমি ভরসা দিয়ে বললাম, "আমরা সবাই আগেই এসে বাসায় সব কিছু রেডি করে ফেলব। তারপর সবাই লুকিয়ে থাকব। প্রিয়াংকা যেই আসবে-"

প্রিয়াংকার আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "বুঝেছি। তোমরা আমাকে আগে জানিয়ে দাও, কবে আসবে, কখন আসবে।"

"জি। জানিয়ে দেব।"

প্রিয়াংকার আব্বুকে একটু মনমরা দেখালো, বললেন, "তোমাকে কী খেতে দেব বলো। ভাল বিস্কুট আছে-"

"না চাচা।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "প্রিয়াংকা এসে আমাকে দেখলে সব বুঝে ফেলবে।"

"তা ঠিক।"

"আমি যাই চাচা।"

"ঠিক আছে।"

"আপনি কিন্তু প্রিয়াংকাকে বলবেন না কিছু।"

"না। বলব না।"

আমি তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হয়ে এলাম।

পরের দিন যখন সবাইকে বলেছি যে সারপ্রাইজ পার্টি করার জন্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি তখন সবাই বেশ অবাক হলো। তারা কেউ চিন্তাও করে নাই যে আমি এতো তাড়াতাড়ি প্রিয়াংকার বাসায় গিয়ে তার আব্বুর সাথে কথাবার্তা

বলে সব ঠিক করে ফেলব। প্রথমে তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না কয়েকবার কিরা-কসম কাটার পর শেষ পর্যন্ত সবাই বিশ্বাস করল।

কাজেই সবাই মিলে এখন পরের অংশটুকু করার জন্যে রেডি হতে লাগলো। ক্লাস-কবি জহুরুলকে দায়িত্ব দেয়া হলো প্রিয়াংকাকে নিয়ে একটা গান লেখার। গান লেখার পর মৌটুসি আর নীলিমা সেটাতে সুর দিলো। গানটার শুরু এরকম :

আমাদের ক্লাসে আছে ছটফটে মেয়ে
দিন কাটে আনন্দে নেচে গান গেয়ে
প্রিয়াংকা সে যে প্রিয়াংকা...

আদনান, ইশতিয়াক, মামুন, জয়ন্ত তারা মিলে একটা নাটক দাঁড়া করাচ্ছে। আমাকেও অভিনয় করতে বলেছিল, আমি রাজি হইনি। আমি ভাল করে কথাই বলতে পারি না, অভিনয় করব কীভাবে? সবার কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। সেগুলো দিয়ে কিছু উপহার কেনা হবে খাবার-দাবার কেনা হবে। কী খাওয়া হবে সেটা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করে ঠিক করা হলো কাবাব এবং পরাটা কিনে আনা হবে। তার সাথে পেপসি। যদি টাকা-পয়সা দিয়ে কুলানো যায় তাহলে দুই কেজি মিষ্টিও কিনে আনা হবে। সারপ্রাইজ পার্টি করার জন্যে বাসাটাকে সাজাতে হবে। রঙিন কাগজ এবং বেলুন দিয়ে সাজানোর জন্যে আমাদের ক্লাস শিল্পী নাঈমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। পুরো ব্যাপারটা করতে হবে ছুটির দিনে, তাই উৎসাহে সবাই ছটফট করতে থাকলেও পরের শুক্রবার দুপুর বেলার আগে সময় ঠিক করা গেলো না। আমি সেটা প্রিয়াংকার আব্বুকে জানানোর জন্যে তাকে ফোন করলাম। ফোন ধরে প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "হ্যালো।"

আমি বললাম, "চাচা, আমি তপু।"

"ও! কী খবর ম্যাথমেটিশিয়ান।"

"জি ভাল। প্রিয়াংকা আশেপাশে নাই তো?"

"না। একটু বাইরে গেছে।"

"চাচা, আমরা শুক্রবার বিকালবেলা টাইম ঠিক করেছি।"

"শুভ। আমার কিছু করতে হবে?"

"না চাচা কিছু করতে হবে না। শুধু–"

"শুধু কী?"

"প্রিয়াংকাকে আধা ঘণ্টার জন্যে যদি বাসা থেকে কোথাও পাঠাতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়।"

প্রিয়াংকার আব্বু এক মুহূর্ত কী একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, আমি কোন কাজে প্রিয়াংকাকে আধাঘণ্টার জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দেব।"

"থ্যাংক ইউ চাচা।"

"কয়টার সময় বাইরে পাঠাব?"

"আড়াইটার সময়।"

"ঠিক আছে। তাহলে আড়াইটা থেকে তিনটার জন্যে তাকে বাইরে পাঠাব। তোমাদের এর মাঝে চলে আসতে হবে।"

"জি চাচা।"

"তাহলে তোমাদের সাথে শুক্রবারে দেখা হবে।"

"জি চাচা। আপনি কিন্তু প্রিয়াংকাকে কিছু বলবেন না।"

প্রিয়াংকার আব্বু হাসলেন, হেসে বললেন, "আমি কিছু বলব না, তবে তোমরা ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিও না। এসব ব্যাপারে প্রিয়াংকা কিন্তু খুব চালাক!"

"জি চাচা। আমরা জানি।"

টেলিফোনটা রেখে আমি বুক থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস বের করে দিলাম, আমার ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা আমি অক্ষরে অক্ষরে করে ফেলেছি। এখন অন্যদের বাকি দায়িত্ব শেষ করতে হবে। দেখা যাক কী হয়!

সেদিন রাত্রিবেলা যখন মিচকি আমার সাথে দেখা করতে এলো আমি তাকে হাতে তুলে নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "বুঝলি মিচকি, আগামী শুক্রবারে আমাদের বিশাল প্ল্যান।"

মিচকি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে প্ল্যানটা ভাল করে শুনতে চাইলো। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "প্রিয়াংকাকে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দেব। সারপ্রাইজ পার্টি মানে বুঝেছিস? হঠাৎ করে একটা পার্টি দিয়ে চমকে দেওয়া।"

রান্নাঘর থেকে দুলি খালা হঠাৎ করে স্টোররুমে উঁকি দিল, বলল, "কী ব্যাপার? তুমি একলা একলা কার সাথে কথা বলো?"

আমি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মিচকিকে আড়াল করে বললাম, "কার সাথে কথা বলব আবার? নিজের সাথে কথা বলি?"

দুলি খালা দাঁত বের করে হাসলো, বলল, "এই বিষয়টা খারাপ না। নিজের সাথে নিজে কথা বললে কোন ঝগড়া-বিবাদ হয় না। তবে খালি একটা সমস্যা!"

"কী সমস্যা দুলি খালা?"

"অন্যেরা শুনলে তারা পাগল ভাবে!" দুলি খালা হাসতে হাসতে আবার রান্নাঘরে চলে গেলো, আমি শুনলাম, বিড়বিড় করে সে নিজের সাথে কথা বলছে।

আমি মিচকিকে এক টুকরো রুটি ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "তাড়াতাড়ি খেয়ে পালিয়ে যা! দুলি খালা দেখলে তোর খবর আছে!"

মিচকি দুই হাতে রুটির টুকরোটা ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে খেতে শুরু করলো।

শুক্রবার দিন দুইটা বাজার আগেই আমি প্রিয়াংকার বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। বাসার ভিতরে এখন ঢোকা যাবে না তাই কাছাকাছি একটা শপিং মলের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। একটু পরে পরে বাইরে গিয়ে তার বাসার দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করি প্রিয়াংকাকে তার আব্বু বাসা থেকে বাইরে পাঠিয়েছেন কী না। আড়াইটার বেশ আগেই আমাদের ক্লাসের আরো অনেকেই চলে এসেছে। সবার হাতেই কোন না কোন ধরনের ব্যাগ না হয় প্যাকেট। আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রইলাম, একজন শুধু প্রিয়াংকার বাসার দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আড়াইটা বাজার আগেই আমরা দেখলাম প্রিয়াংকা তার বাসা থেকে বের হয়েছে। তার পিঠে একটা ব্যাগ, হাতে একটা কাগজ। কাগজটা পড়ে সেটা ব্যাগে রেখে সে এদিক সেদিক তাকিয়ে রাস্তায় নেমে একটা রিকশা নিলো। রিকশাটা চলে যাবার সাথে সাথেই আমরা চারিদিক থেকে বের হয়ে, প্রায় দৌড়ে প্রিয়াংকার বাসায় চলে এলাম। সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো। প্রিয়াংকার আব্বু তার হুইল চেয়ারে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। প্রিয়াংকার আব্বু যে হুইল চেয়ারে থাকেন সেটা আগেই সবাইকে বলে রেখেছিলাম তাই সবাই সেটা স্বাভাবিক ভাবে নিল। প্রিয়াংকার আব্বু আমাদের দেখে বললেন, "তোমরা এসে গেছ তাহলে?"

আমি বললাম, "জি চাচা।"

প্রিয়াংকার আব্বু বললেন, "তোমাদের হাতে আধা ঘন্টা সময়। আমি প্রিয়াংকাকে পাঠিয়েছি একটা ওষুধ কিনে আনতে ফার্মেসি থেকে, কিন্তু আধা ঘন্টার মাঝে চলে আসবে।"

জয়ন্ত বলল, "আধা ঘন্টার মাঝেই সবাই চলে আসবে, আংকেল।"

জয়ন্তের কথা হবার আগেই মৌটুসি আর নীলিমা একটা হারমোনিয়াম আর কিছু পোঁটলাপুটলি নিয়ে ঢুকলো। তাদের পিছু পিছু আরো কয়েকজন। এবং আরো কিছুক্ষণের মাঝে আরো অনেকে। দেখতে দেখতে প্রায় সবাই চলে এসেছে– প্রিয়াংকার আব্বু আমাদের কাজ করতে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

নাঈমা রঙিন কাগজ কেটে লিখে এনেছে "জয় হোক প্রিয়াংকার" সেটা দেওয়ালে লাগানো হলো। বেলুন ফুলিয়ে ফুলিয়ে ঘরের নানা জায়গায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখা হলো। মৌটুসি-নীলিমা আর তার দলবল হারমোনিয়াম নিয়ে রেডি। আদনান, ইশতিয়াক মামুন আর জয়ন্ত তাদের নাটকের জন্যে রেডি। আদনান এবং ইশতিয়াক হবে সন্ত্রাসী, মামুন পুলিশ অফিসার আর জয়ন্ত পথচারী। সন্ত্রাসী আদনান এবং ইশতিয়াকের হাতে অস্ত্র, তাদের চেহারা বিদঘুটে, পুলিশ অফিসার মামুন নকল গোঁফ লাগিয়েছে, পথচারী জয়ন্ত হাবাগোবা সেজে বসে আছে।

শিউলি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, প্রিয়াংকাকে দেখলেই আমাদের সতর্ক করে দেবে। আমরা তখন সবাই দরজার কাছে চলে আসব।

তিনটা বাজার সাথে সাথেই প্রিয়াংকার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। আমাদের সাথে প্রিয়াংকার আব্বুও আছেন, মুখে হালকা একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে তার হুইল চেয়ারে বসে আছেন। ঠিক তিনটা দশে প্রিয়াংকাকে রিকশা করে আসতে দেখা গেলো, শিউলি চাপা গলায় বলল, "প্রিয়াংকা আসছে! সবাই রেডি!"

আমরা সবাই তখন দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়ালাম। উত্তেজনায় আমাদের বুক ধুকপুক করছে, শুনতে পাচ্ছি সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। দরজার সামনে দাঁড়ালো, তারপর দরজায় শব্দ করলো। আদনান টান দিয়ে দরজা খুলে ফেললো আর আমরা সবাই বিকট গলায় চিৎকার করে উঠলাম, "সা-র-প্রা-ই-জ!!"

তারপর যে ঘটনা ঘটলো আমরা তার জন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। প্রিয়াংকা ভয়ানক চমকে লফিয়ে পিছিয়ে সরে যেতে গিয়ে পা বেঁধে পড়ে গেলো। আমরা দেখলাম সে সিঁড়িতে একেবারে মাথা উল্টে পড়ে গেছে, দেওয়ালে জোরে তার মাথা লেগেছে এবং সেভাবে গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে সিঁড়ির নিচে সে আটকে গেলো। একটা হাত তার শরীরের নিচে এমন অস্বাভাবিকভাবে ঢুকে আছে যে দেখলেই বোঝা যায় হাতটা নিশ্চয়ই ভেঙ্গে

গেছে। আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, প্রিয়াংকা নিথর হয়ে পড়ে আছে নড়ছে না। ভয়ে-আতংকে আমার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ করে যেন থেমে গেলো।

আমি শুনলাম প্রিয়াংকার আব্বু বলছেন, "তোমাদের কেউ একজন আমাকে ধরে একটু নিচে নামিয়ে নিয়ে যাও, প্রিয়াংকার কাছে। প্লিজ।"

হাসপাতালে নেয়ার পর যখন প্রিয়াংকাকে এক্সরে করা হচ্ছে তখন তার জ্ঞান ফিরে এলো। ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে ভেঙ্গে গেছে সেটা প্লাস্টার করে দেয়া হলো। যেহেতু মাথায় ব্যথা পেয়েছে সে জন্যে তাকে হাসপাতালে আরো তিনদিন রাখা হলো চোখে চোখে রাখার জন্যে। যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় তখন আমরা অনেকে সেখানে ছিলাম। প্রিয়াংকার আব্বু যখন প্রিয়াংকাকে নিয়ে অনেক কষ্ট করে ক্যাবে উঠে তার হুইল চেয়ারটা ভাঁজ করে পিছনে রাখছেন তখন আমার দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে একটু হেসে বললেন, "বুঝলে ইয়ং ম্যাথমেটিশিয়ান, এ জন্যে আমি সব সময় সারপ্রাইজ পার্টিকে একটু ভয় পাই! সারপ্রাইজটা কোন দিক থেকে আসবে কেউ বুঝতে পারে না!"

প্রিয়াংকার হাতের প্লাস্টার না খোলা পর্যন্ত আমরা সবাই পালা করে তার ক্লাস নোট লিখে দিয়েছি, হোমওয়ার্ক খাতায় তুলে দিয়েছি। স্কুলে টিফিনের সময় যখন দরকার হয়েছে তাকে খাইয়ে দিয়েছি। প্রত্যেক দিন বিকালে তার স্কুলের ব্যাগ ঘাড়ে করে বাসায় পৌঁছে দিয়েছি। ক্লাসের সব ছেলেরা বলল তারা সবাই মিলে এক হাজার বার কান ধরে উঠ বোস করবে, প্রিয়াংকার মনটা নরম করতে এক হাজার বার করতে হয় নাই একশবার করার পরই সে সবাইকে মাফ করে দিয়েছে।

প্রিয়াংকা মাফ করে দিয়েছে সত্যি কিন্তু তার আব্বু আমাদের মাফ করছেন কী না, কিংবা এখন না করলেও পরে কোন দিন মাফ করবেন কী না সেই বিষয়ে আমাদের সবারই খুব সন্দেহ রয়ে গেছে।

ফেরা

আম্মুর কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে কী কিছু একটা হয়েছে সেটা আমি কেমন করে জানি সেটাও আমি জানি না, কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত আম্মুর কিছু একটা হয়েছে। অন্ধ মানুষেরা চোখে দেখতে পায় না বলে তারা সবকিছু শব্দ দিয়ে অনুভব করে। আমিও আসলে অন্ধ মানুষের মতো, আমি আম্মুকে দেখি না। আম্মুর সাথে আমার দেখা হয় যখন আম্মু আমাকে মারেন তখন। বাকি সময়টুকু আমি আম্মুকে অনুভব করি শব্দ দিয়ে। আমি স্টোররুমে আমার ছোট বিছানা থেকে আম্মুর প্রত্যেকটা শব্দ শুনতে পাই। আম্মু ঘুম থেকে উঠছেন, বাথরুমে যাচ্ছেন, জানালা খুলে বাইরে তাকাচ্ছেন, গুনগুন করে গান গাইছেন- আম্মুর প্রত্যেকটা শব্দ আমি খুঁটিয়ে খুটিয়ে শুনি। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে হাসছেন, সিডিতে গান শুনছেন কিংবা খাবার টেবিলে বসে ভাইয়া আর আপুর সাথে গল্প করছেন, সবকিছু শুনে শুনে সেগুলো আমার মাথার মাঝে গেঁথে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ যখন আমার সাথে দেখা হয়, এক মুহূর্তে যখন রেগে আগুন হয়ে যান, তখন যখন হিংস্রভাবে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তখনও আমি বুঝতে পারি আম্মু কখন কী করবেন।

অন্ধ মানুষের মতো শুধু শব্দ শুনে শুনে আমি গত তিন বছর আম্মুকে বোঝার চেষ্টা করেছি, তাই যখন স্টোররুমের কোনায় বসে হঠাৎ করে আম্মুর পরিচিত শব্দগুলো শুনতে পাই না তখন বুঝতে পারি আম্মুর কিছু একটা হয়েছে। খাবার টেবিলেও আম্মু আজকাল আগের মতো কথা বলেন না। অনেক সময় নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করেন। মাঝে মাঝে আমার আম্মুকে দেখার ইচ্ছে করে, কিন্তু আমি সাহস পাই না।

সেদিন রাত্রিবেলা আমি মিচকিকে হাতে নিয়ে তার সাথে ফিসফিস করে কথা বলছি— এটা আমার আজকাল অনেকটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে, সারাদিন কী হয়েছে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে বলি। আমি জানি শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় মিচকি আমার সব কথা

বুঝতে পারে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমি একটু নিজের অজান্তেই একটু জোরে কথা বলে ফেলেছি। আম্মু কী কারণে রান্নাঘরে এসেছেন আমার গলার স্বর শুনে, নিঃশব্দে স্টোররুমে এসেছেন দেখতে আমি কার সাথে কথা বলছি।

আমি খেয়াল করি নি, হঠাৎ করে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি আম্মু দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার হাতের তালুতে মিচকি বসে ছিল, সেও তখন ঠিক আমার মতো অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়েছে।

আম্মুর মুখটা ঘেন্নায় বাঁকা হয়ে গেলো, মুখ বিকৃত করে বললেন, "তোর হাতে এটা কী?"

আমি হাতটা নামিয়ে মিচকিকে লুকিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আম্মু চিৎকার করে বললেন, "ইঁদুর? তোর হাতে ইঁদুর?"

আমি মিচকিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সেটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বোকা ইঁদুরটা সেটা বুঝলো না, মনে করলো সেটা আরেকটা খেলা, লাফিয়ে আমার হাত বেয়ে কাঁধে উঠে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইল। আম্মুকে দেখে মনে হলো বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন, আমি জানি এখনই আম্মু চিলের মতো চিৎকার করে উঠবেন, তারপর হাতের কাছে যেটাই পান সেটা নিয়ে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু আমি দেখলাম আম্মু কিছুই করলেন না, বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়েই থাকলেন।

আমি এতোটুকু শব্দ না করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম, আম্মুও আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আমার মনে হতে লাগলো আম্মু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমাকে দেখছেন না। আম্মু তখন ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত দিলেন, তার মুখটায় যন্ত্রণায় একটা চিহ্ন ফুটে উঠল, সেইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টলতে টলতে কীভাবে জানি স্টোররুম থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি একটু পরে শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আম্মু ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখে চুপচাপ নিঃশব্দে বসে আছেন। আমার খুব ইচ্ছে হলো আম্মুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, "আম্মু তোমার কী হয়েছে?" কিন্তু সাহস হলো না।

রাত্রিবেলা আমি দুলি খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, "দুলি খালা? আম্মুর কী হয়েছে?"

দুলি খালা অবাক হয়ে বলল, "কী হবে? কিছু হয় নাই?"

"তাহলে আম্মু আজকাল এতো কম কথা বলে কেন?"

"তোমার আম্মু কুনোদিনই বেশি কথা বলে নাই-" বলে দুলি খালা পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলো।

সেদিন রাত্রে আমি খুব সাহসের একটা কাজ করলাম, রাত্রিবেলা যখন সবাই নিজের নিজের ঘরে চলে গেছে তখন আমি পা টিপে টিপে আপুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। আপু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো, ভুরু কুঁচকে ফিসফিস করে বলল,"তপু?"

"হ্যাঁ, আপু।"

"কী হয়েছে?"

"আপু- আম্মুর কী হয়েছে?"

আপু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, বলল, "কার?"

"আম্মুর।"

"কী হবে?"

"আম্মু কেমন জানি অন্যরকম ব্যবহার করছেন।"

আপু তখনও আমার কথা বুঝতে পারছিলো না, মাথা নেড়ে বলল, "কীরকম অন্যরকম ব্যবহার করছেন?"

আমি বললাম, "আমি জানি না।"

আপু আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি কী করব বুঝতে না পেরে আমার স্টোররুমে ফিরে এলাম।

আমার সন্দেহটা যে সত্যি সেটা সপ্তাহখানেকের মাঝে সবাই বুঝতে পারলো। আম্মুর অফিসের গাড়ি এসেছে, অফিসে যাবার জন্যে আম্মু বের হবেন, হঠাৎ করে ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে হাটু ভেঙ্গে পড়ে গেলেন। টেবিলের কোনায় মাথা লেগে মাথার বেশ খানিকটা কেটে গেলো। আম্মু যদিও উঠে বসে, "আমার কিছু হয় নি, আমার কিছু হয় নি" বলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু অন্যেরা তার কথা শুনলো না। তাকে ধরে একরকম জোর করে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। মাথায় ব্যথা পেয়েছেন বলে মাথার এক্সরে করে দেখতে পেলো মাথার ভেতরে একটা বড় টিউমার।

এর পরে সবকিছু কেমন যেন দ্রুত ঘটতে লাগলো। টিউমারটি মোটেও নিরীহ টিউমার না। এটাকে অপারেশন করতে হবে, অপারেশন করলেই যে আম্মু ভাল হয়ে যাবেন কোন ডাক্তার সেটাও দাবি করল না। আম্মু হাসপাতালে আছেন, প্রতিদিন বিকেলে ভাইয়া আর আপুর কাছে আম্মুর খবর শুনতে পাই।

যে সব বিষয়ে আম্মু বিচলিত হন সেগুলো না করার জন্যে ডাক্তারের কড়া নির্দেশ তাই আমার হাসপাতালে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। আমি তাই হাসপাতালে যেতে পারি না, আপু কিংবা ভাইয়া বাসায় এলে তাদের কাছে আম্মুর খবর নিই। খুব দ্রুত আম্মুর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতে লাগলো, আমাকে কেউ সেটা বলে দেয় নি কিন্তু আমি জানি আম্মুর মাথায় ভয়ংকর একটা অপারেশন হবে। শুধু অপারেশন হলে হবে না। তারপর কোন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে হবে। শুধুমাত্র তাহলেই আম্মুকে বাঁচানো সম্ভব।

আম্মু বাসায় নেই বলে আমাকে স্টোররুমে বসে থাকতে হয় না। আমি মাঝে মাঝে বাসার ভেতরে হাঁটাহাঁটি করি। অনেক দিন পর আমি আম্মুর ঘরে গিয়েছিলাম। ড্রেসিং টেবিলের উপর তার পাউডার, লিপস্টিক পারফিউম সাজানো। চিরুনিতে আম্মুর দুই একটা চুল লেগে আছে। ওয়ারড্রোবের ভেতরে আম্মুর শাড়ি ব্লাউজ। বিছানায় গায়ে দেয়ার কম্বল ভাঁজ করে রাখা আছে, শুধু আম্মু নেই। দেওয়ালে আব্বু আর আম্মুর ছবি, বিয়ের পরপর তোলা, দুজনকেই দেখাচ্ছে খুব কম বয়সী, দুজনে এমনভাবে হাসছেন যে মনে হয় একটু খেয়াল করলে হাসির শব্দ শোনা যাবে।

বসার ঘরে বসে একদিন টেলিভিশন অন করেছি, কতোদিন টেলিভিশন দেখি না বলে জানি না আজকাল টেলিভিশনে কতো রকম নতুন নতুন চ্যানেল বের হয়েছে! কিছু কিছু খুব মজার আর কিছু কিছু এতো উদ্ভট যে মানুষজন কেমন করে দেখে সেটাই আমি চিন্তা করে পাই না। টেলিভিশন না দেখে না দেখে আমার টেলিভিশন দেখার অভ্যাস চলে গেছে তাই কিছুক্ষণ দেখার পরই আমার কেমন জানি বিরক্তি লাগতে থাকে। আমি টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে উঠে আসি। বাইরের ঘরে শেলফে অনেক বই। আমি বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখি কিন্তু মনের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা তাই কোন কিছু আর পড়তে ইচ্ছে করে না।

আম্মুর মাথার অপারেশন হলো দুই সপ্তাহ পরে। তাকে বিদেশে নেয়া হবে কী না সেটা নিয়েও একটু আলোচনা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামা খালারা আপু আর ভাইয়ার সাথে কথা বলে এখানেই অপারেশন করবেন বলে ঠিক করলেন। যেদিন অপারেশন করা হবে সেদিন সকাল থেকে আমি হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন আম্মুকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় তখন আপু আর ভাইয়া আম্মুর কাছে গিয়ে তার হাত ধরে রইলো। আমি দূরে একটা দরজার

আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম যেন আমাকে দেখতে না পান। হঠাৎ করে দেখে ফেললে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

অপারেশনটি শেষ হতে ছয় ঘন্টা সময় নিলো, যারা অপারেশন করেন তারা টানা ছয় ঘন্টা বিশ্রাম না করে কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন কে জানে। অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে আম্মুকে একটা ঘরে নিয়ে রাখা হলো। আম্মুর জ্ঞান নেই বলে আপু আর ভাইয়ার সাথে আমিও দেখতে গেলাম। মাথার মাঝে ব্যান্ডেজ, নাক এবং মুখ থেকে প্ল্যাস্টিকের নল বের হয়ে আসছে। চোখ বন্ধ এবং মুখ অল্প খোলা, নিঃশ্বাসের সাথে সাথে এক ধরনের শব্দ হচ্ছে, কেমন যেন অস্বস্তিকর একটি শব্দ, শুনলে বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। শরীরের নানা জায়গা থেকে নানারকম তার বের হয়ে এসেছে, চারপাশে অনেক রকম যন্ত্রপাতি, সেগুলোতে অনেক রকম আলো, অনেক রকম শব্দ। আম্মুকে দেখে আমার কাছে একজন অচেনা মানুষ বলে মনে হতে লাগলো। আমাদের সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে দিলো না, একটু পরেই একজন নার্স এসে আমাদের বের করে নিয়ে এলো।

আম্মুর জ্ঞান ফিরবে কী না সেটা নিয়ে সবার ভেতরে সন্দেহ ছিল, কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আম্মুর জ্ঞান ফিরে এলো। আপু আর ভাইয়া যখন আম্মুর সাথে কথা বলে ফিরে এলো আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আম্মু কেমন আছেন?"

আপু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আগের মতোই।"

"কথা বলেছেন আম্মু?"

"হ্যাঁ। একটু বলেছেন।"

"কী বলেছেন আম্মু?"

আপু হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার মতো করে বলল, "এই তো এটা সেটা।"

আমি অনেক আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার কথা কিছু বলেছেন আম্মু?"

আপু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো, বলল, "না। আম্মু তোর কথা কিছু জিজ্ঞেস করে নাই।"

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে সরে এলাম। আমি একেবারে গোপনে একটা ছেলেমানুষী আশা করে বসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আম্মুর মাথায় সেই ভয়ংকর টিউমারটির জন্যে আম্মু আমাকে সহ্য করতে পারেন না। সেই টিউমারটি এখন কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে এখন হয়তো আম্মু আবার আগের

মতো আমাকে ভালবাসবেন! আপুর কথা শুনে বুঝতে পারলাম সেটি সত্যি নয়। ঠিক কেন জানি না আমার বুকটা ভেঙ্গে গেলো অন্য রকম একটা কষ্টে।

ধীরে ধীরে আম্মুর অবস্থা আরো খারাপ হলো। আমি দেখতে পারবো না জেনেও প্রত্যেক দিন এসে ঘরের বইরে বসে থাকতাম। ভাইয়া আর আপু ভেতরে গিয়ে আম্মুর সাথে একটু কথা বলে বের হয়ে আসতো, আমি তাদের কাছে জানতে চাইতাম আম্মু কেমন আছেন। তারা পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারতো না, দায়সারা কিছু একটা বলতো। আমি অপেক্ষা করতাম কখন আম্মু ঘুমাবেন তখন দূর থেকে তাকে গিয়ে দেখে আসতাম, শুধু ভয় করতো হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙ্গে আমাকে দেখে রেগে যান তখন কী হবে? তাকে একবার হাত দিয়ে ছোঁয়ার জন্যে আমার সমস্ত শরীর আকুলি বিকুলি করতো। শুধু মনে হতো একবার যদি আম্মুর বুকের ওপর মাথা রেখে আম্মুর সাথে একটা কথা বলতে পারতাম! সাধারণ একটা কথা। সহজ একটা কথা!

ধীরে ধীরে সবাই বুঝতে পারলো আম্মু আসলে বাঁচবেন না। আম্মু বেশিরভাগ সময় জাগা এবং ঘুমের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থাকেন। আজকাল মাঝে মাঝে আপু আর ভাইয়াকেও নাকী চিনতে পারেন না। সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারি না, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে চাই আম্মু আমার কথা কিছু বলেছেন কী না। কিন্তু কখনোই বলেন না। আমি যে আছি সে কথাটাই যেন ভুলে গেছেন। আর কয়দিন পর আম্মু আর কাউকেই চিনবেন না তখন কী হবে? আম্মুর জীবন থেকে আমি একেবারেই হারিয়ে যাব?

খুব মন খারাপ করে একদিন আমি হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ ডাক্তারদের সাদা গাউন পরা একজন ভদ্রমহিলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে আমি কোথায় দেখেছি?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "মনে হয় এইখানে। আমি প্রত্যেক দিন এখানে আসি।"

"উঁহুঁ, এইখানে না। আমি তো এইখানে আগে আসি নাই।" ডাক্তার ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ আমার দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকলেন। হঠাৎ তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, "মনে পড়েছে! তুমি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন! গ্রেট ম্যাথমেটিশিয়ান!"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি আমার মেয়েকে সেই কম্পিটিশনে নিয়ে গিয়েছিলাম! আমার মেয়ে তোমার অটোগ্রাফ নিয়েছিল।"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বলল, "ও।"

"তুমি এখানে কেন?"

"আমার আম্মুর মাথায় অপারেশন হয়েছে।"

"কতো নম্বর বেড।"

"সতেরো।"

ভদ্রমহিলা আর কিছু না বলে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি একা একা বাইরে বসে আছি তখন দেখতে পেলাম সেই ডাক্তার ভদ্রমহিলা আবার বের হয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে আবার আমার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি কী তোমার মায়ের সাথে কথা বলতে চাও?"

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না-না।"

ডাক্তার ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, "কেন না?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাক্তার ভদ্রমহিলা বললেন, "এসো ভেতরে এসো।" একটু থেমে নরম গলায় বললেন, "তোমার আম্মু এই সময়টাতে নিশ্চয়ই তার ছেলেমেয়েকে দেখতে চাইবেন।"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আমার আম্মুর সামনে যাওয়া নিষেধ। আমাকে দেখলেই আম্মু রেগে যান।"

ডাক্তার ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার আম্মুর আর রেগে ওঠার ক্ষমতাটুকু নেই খোকা!" ভদ্রমহিলা আমার হাত ধরে বললেন, "এসো আমার সাথে।"

ভেতরে পাশাপাশি অনেকগুলো বেড। আম্মুর বেডটা এক কোনায়, ডাক্তার ভদ্রমহিলা আমাকে আম্মুর বেডের কাছে নিয়ে গেলেন। আম্মু চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন পায়ের শব্দ শুনে চোখ খুলে তাকালেন। ডাক্তার ভদ্রমহিলা আম্মুকে বললেন, "আপনার ছেলে আপনাকে দেখতে এসেছে।" তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার আম্মুর সাথে কথা বলো। আমি আমার পেশেন্টকে একটু দেখে আসি।"

আম্মু কিছু না বলে আমার দিকে তাকালেন। আমিও আম্মুর দিকে তাকালাম। আব্বু মারা যাবার পর আমি যতবার আম্মুর চোখে দিকে তাকিয়েছি ততবার আম্মুর চোখ ধ্বক করে জ্বলে উঠেছে, এই প্রথমবার আম্মুর চোখ ধ্বক করে জ্বলে উঠল না। আম্মু স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। খুব ধীরে ধীরে আম্মুর চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠলো। আম্মুর ঠোঁট দুটো হঠাৎ নড়ে উঠলো, কিছু একটা বলার চেষ্টা করছেন। আমি আম্মুর কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম, শুনলাম আম্মু আমাকে ডাকলেন, "তপু।"

আমি বললাম, "কী আম্মু?"

আম্মু ফিসফিস করে বললেন, "তুই একটু সামনে দাঁড়া। তোকে দেখি।"

আমি আম্মুর সামনে দাঁড়ালাম। আম্মু অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ফিসফিস করে বললেন, "আমি তোর ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না আম্মু করো নি।"

আম্মু বললেন, "করেছি। আমি জানি।" আম্মু কেমন জানি ক্লান্ত হয়ে গেলেন। মনে হলো কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে একটু শক্তি সঞ্চয় করলেন, তারপর বললেন, "তোর আব্বু মারা যাবার পর আমার যে কী হয়ে গেলো আমি জানি না। আমি তোকে সহ্য করতে পারতাম না তপু।'

আমি আম্মুর আরেকটু কাছে এগিয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমি তোমার হাতটা একটু ধরি আম্মু?"

"ধরবি? ধর।"

আমি আস্তে আস্তে আমার আম্মুর হাতটি ধরলাম, আহা! কী শুকনো আর ঠাণ্ডা হাত। হাতটা ধরেই আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। আম্মু স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, ফিসফিস করে বললেন, "আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি তপু। অনেক কষ্ট।"

"না আম্মু দেও নাই।"

"দিয়েছি।"

আমি আম্মুর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তুমি আমাকে কতো আদর করতে মনে আছে?"

আম্মু মাথা নাড়লেন। তার মুখে হঠাৎ এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল। আহা! কতোদিন পর আমার আম্মু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, "আমার শুধু সেই আদরের কথা মনে আছে। আর কিছু মনে নাই আম্মু।"

আম্মু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সত্যি?"

"সত্যি আম্মু।"

আম্মু আমাকে তার দুর্বল হাত দিয়ে টানলেন, বললেন, "আয় বাবা। আমার আরেকটু কাছে আয়।"

আমি আম্মুর আরেকটু কাছে গেলাম। আম্মু আমাকে তার বুকের মাঝে টেনে নিলেন।

আহা! কতো দিন, কতো রাত, কতো যুগ থেকে আমি এই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম! আমি দুই হাত দিয়ে আম্মুকে শক্ত করে ধরে রাখলাম। আমার শুধু মনে হতে লাগলো ছেড়ে দিলেই বুঝি আম্মু চলে যাবেন। খোদা! হেই খোদা– আমার আম্মুকে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো না। তোমার দোহাই লাগে খোদা!

কিন্তু খোদা আমার কথা শুনলেন না। আমার আম্মু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে মারা গেলেন।

বাইরে প্রিয়াংকা মৌটুসি শিউলী আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বের হতে দেখে তারা এগিয়ে এলো। প্রিয়াংকা চোখের পানি মুছে নরম গলায় বলল, "তপু।"

আমি প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলাম। মা মারা গেলে একজন হাসে কেমন করে সেটা কেউ বুঝতে পারল না। আমি জানি তারা বুঝতে পারবে না। মা মারা গেছেন বলে তো আমি হাসছিলাম না। অনেক দিন পর শেষ পর্যন্ত আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিলাম বলে হাসছিলাম।

কেউ সেটা বুঝতে পারে নি। শুধু প্রিয়াংকা বুঝতে পেরেছিল। আমি দেখলাম শুধু সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

চোখে পানি আর ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি– এটি কী বিচিত্র একটি দৃশ্য!

---

pathfinder